পরাণ-মণ্ডল

ও

অন্যান্য গল্প

শ্রীজলধর সেন।

পাঁচ সিকা।

Printed by Gopal Chandra Ray
THE PARAGON PRESS,
203-1-1 Cornwallis Street.
and
Published by Gurudas Chatterji of
Messrs. Gurudas Chatterji & Sons
201, Cornwallis Street Calcutta.

বর্দ্ধমানাধিপতি

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ

বিজয়চন্দ মহতাব

বাহাদুরের করকমলে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার

নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

উৎসর্গ করা

হইল

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মাননীয়

শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্তাব্ বাহাদুর।

শ্রীগোপাল প্রেস

নিবেদন।

বড়মানুষের সুখ দুঃখের কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন; দুঃখী-দরিদ্রের কথা বড় একটা বলিতে শুনি না। আমি নিজে দুঃখী ও দরিদ্র, তাই আমাদের দেশের দরিদ্রের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা আমার বলিতে ভাল লাগে। সেই জন্যই আমি এই কয়েকটি ছোট গল্প লইয়া পূজার বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। গরিবের ঘরের কথা কি সকলের ভাল লাগিবে?

এই পুস্তকখানি প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বর্দ্ধমানের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি নানা রকমে কৃতজ্ঞ; তাহার পর তিনি এখন আবার এই ভাবে আমাকে অধিকতর ঋণগ্রস্ত করিতেছেন। জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিনে ত আর সে ঋণের কণামাত্রও শোধ, করিতে পারিব না;—সুধু দশজনের কাছে সেই ঋণ স্বীকার করিয়াই আমাকে এ যাত্রায় চলিয়া যাইতে হইতেছে।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩২১

শ্রীজলধর সেন।

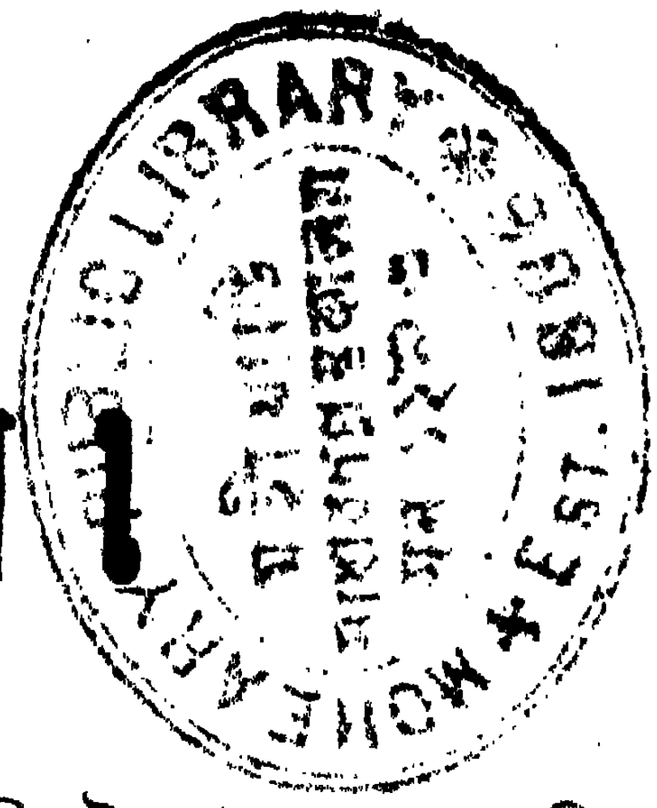

পরাণ মণ্ডল।

LIBRARY

মামুদপুর গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই বাস। গ্রামখানিও নিতান্ত ছোট নহে। গ্রামে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। উভয় জাতির মধ্যেই দুই চারি ঘর অবস্থাপন্ন গৃহস্থও আছে।

ওলাদেবী প্রায় প্রতি বৎসরই এই গ্রামে শুভ পদার্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা বা শুভদৃষ্টি মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর উপরই অধিক ছিল। দেবতারাও জাতিভেদ মানেন!

এই পক্ষপাতদোষ ক্ষালনের জন্য একবার দেবী গ্রামে আসিয়াই প্রথমে মুসলমান পল্লীতে শুভ পদার্পণ করেন। তিন দিনের মধ্যেই হারু মণ্ডল ও তাহার স্ত্রী এই দেবীর কৃপায় কোন্ এক অজানা অচেনা দেশে চলিয়া গেল। মণ্ডলের বাড়ীতে রহিল তাহার সাবালক বড় ছেলে পরাণ ও নাবালক ছোট ছেলে নয়ান। স্ত্রীলোকের মধ্যে রহিল পরাণের যুবতী পত্নী; নয়ানের বয়স তখন সাত বৎসর।

পরাণের স্ত্রীর বয়স যদিও উনিশ বৎসর; কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে উনচল্লিশ বৎসরের বুদ্ধি খেলিত; আর সে বুদ্ধির গতিটা "সু"র দিকে না গিয়া "কু"রই দিকে গিয়াছিল। এতদিন মাথার উপর বাঘের মত শ্বশুর ও বাঘিনীর মত শাশুড়ী থাকায় পরাণপত্নী টুঁ শব্দটী করিবারও সাহস পায়

নাই। পরাণ যদিও পঁচিশ বৎসর বয়সের যুবক, কিন্তু সে ত স্কুল কলেজে পড়ে নাই, সভ্যতার আলোকও পায় নাই ; সুতরাং সে পত্নীর জন্য মাতা পিতার অবাধ্য হইতে শিক্ষালাভ করে নাই। চাষার ছেলে, চাষবাস করে, খায় দায়, আমোদ আহ্লাদ করে, আর এই পঁচিশ বৎসর বয়সেও বাপের কথার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, তাহার সম্মুখে কথা বলিতেও সাহস পায় না,—পরাণ সত্যসত্যই গো-বেচারী ভালমানুষ।

পরাণের স্ত্রী নয়ানকে দেখিতে পারিত না। তাহার মনে কেন যে নয়ানের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একে স্ত্রীলোক, তায় সুন্দরী যুবতী ; তাহার মনের ভাব "দেবাঃ ন জানন্তি" আমরা ত ক্ষুদ্র মানুষ !

এতদিন মাথার উপর শ্বশুর শাশুড়ী ছিল,—তাই পরাণের স্ত্রী আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে নাই। সে হয় ত প্রতিদিন আল্লার কাছে শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুকামনা করিত ; কিন্তু আল্লা, পীর বা প্যায়গম্বর কেহই তাহার এ আবেদন বা অব্‌দারে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে কি কারণে জানি না, ওলাদেবী তাহার আরজ মঞ্জুর করিলেন। পরাণের বাপ মা সংসারের কর্ত্তৃত্বভার তাহাদের পুত্রবধূর উপর সমর্পণ করিয়া ওলাদেবীর অনুসরণ করিল। পরাণের স্ত্রী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সংসারের কর্ত্তৃত্বভার হাতে পাইয়াই পরাণ-পত্নী নয়ানের উপর তাহার ক্ষমতা জাহির করিতে লাগিল। বৌ যখন অকারণ তাহার উপর বাক্য-বাণ বর্ষণ করিত, তখন সে ছেলেমানুষ ছলছল নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত · একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। বাপমায়ের মৃত্যুর পর প্রথম প্রথম দুই চারি দিন সে বৌয়ের নিকট এটা ওটা চাহিত, ক্ষুধাবোধ হইলে খাইতে চাহিত ; কিন্তু সে যখন দেখিল যে বৌ মুখনাড়া না দিয়া কথা বলে না, তখন সে ক্ষুধায় কাতর হইলেও মুখ ফুটিয়া ভাত

চাহিত না ; সাত বৎসরের বালক তখনই বুঝিয়াছিল যে, বাপমায়ের সঙ্গেই তাহার আদর আব্‌দারেরও কব্বর হইয়াছে।

পরাণের বাপের বিঘা আষ্টেক জমি ছিল। তাহারা বাপবেটায় সেই জমি চাষ করিত। জমিতে যে ধান ও রবিশস্য হইত, তাহার দ্বারা সারা বৎসর চলিত না—দেশে অজন্মা যে লাগিয়াই আছে। সেইজন্যই যখন তাহাদের চাষের তাড়া না থাকিত, তখন তাহারা বাপবেটায় মজুর খাটিত। তাহারা কখনও বা অন্যের জমি চাষ করিয়া দিত, কখনও বা ঘরামীর কাজ করিত। এই উপায়ে তাহাদের যাহা লাভ হইত, তাহাতে তাহাদের সংসার চলিয়া যাইত। তাহারা যদি ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে মাসে মাসে কিছু কিছু,—টাকাটা সিকেটা সঞ্চয়ও করিতে পারিত। কিন্তু সঞ্চয় করা বা ভবিষ্যৎচিন্তা করা বাঙ্গালার চাষার কোষ্টিতে লেখে না! হারুমণ্ডল ও পরাণ কৃষকের মতই ছিল। যে দিন জন খাটিয়া বাপবেটায় দশ আনা পয়সা পাইত, সে দিন ছয় আনা দিয়া হয় ত একটা ইলিশ মাছই কিনিত, দুই আনা দিয়া দুই ভাঁড় দধিই কিনিত। তাহার পরদিন হয় ত বেগুনভাতে ভাত,—অনেক সময় তাহাও মিলিত না। সুতরাং হারু মণ্ডল যখন মরিয়া গেল, তখন পরাণের ঘরে একটী পয়সাও ছিল না। দুই বাপবেটায় রোজগার করিত ; এখন বাবা চলিয়া গেল ; একেলা পরাণ চাষের কাজই দেখিবে, না জনমজুরই খাটিবে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাড়ীতে খাইবার লোক সবে তিন জন। তবুও পরাণকে খাটিতে হইত ; সে যে দুদণ্ড বসিবে, বা ছোট ভাইটীর তত্ত্ব লইবে, তাহা আর তাহার ঘটিয়া উঠিত না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বা কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া সে শুধু বলিত "ওরে নয়ানে, গরু দুটো গোয়ালে তুলেছিস্ ত, ভাল ক'রে জাব দিইছিস ?" নয়ান যখন সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িত, তখন পরাণ নিশ্চিন্ত হইয়া বলিত "তবে এক কল্‌কে তামুক সাজ্‌।" নয়ান তামাক সাজিয়া দিত, পরাণ তামাক খাইয়া হাত মুখ

ধুইতে যাইত। তাহার পর তাহার স্ত্রী যাহা কোলের কাছে ধরিয়া দিত, তাহাই দুইটা নাকে মুখে দিয়া শুইয়া পড়িত। ভাইয়ের যে অযত্ন হইতেছে বা হইতে পারে, একথা তাহার মনেই আসিত না। তাহার স্ত্রীর প্রকৃতি তাহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু সেই ভালমানুষের মেয়ে যে এমন একটা কচি ছেলের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে, এ কথা তাহার সাদা-সিদে চাষা বুদ্ধিতে আসিত না।

একদিন পরাণের স্ত্রী নয়ানকে পুকুর হইতে একটা পাথরের বাটী ধুইয়া আনিতে বলিয়াছিল। পাড়াগাঁয়ের পুকুরে ত আর বাঁধা ঘাট থাকে না, ইঁটের তৈরি সিঁড়িও থাকে না। নয়ানদের বাড়ীর পাশেই যে পুকুর ছিল, তাহার একটী ঘাটে দুইটা তালগাছ ফেলা ছিল; সেই তালের গুঁড়ি দুইটাই ঘাটের সিঁড়ির কাজ করিত। জলের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া গুঁড়ি দুইটায় সেঁতলা ধরিয়া গিয়াছিল; ভয়ানক পিচ্ছিল হইয়াছিল। সকলেই বিশেষ সাবধানে সেই ঘাটে নামা ওঠা করিত। নয়ান যখন পাথরের বাটী ধুইবার জন্য ঘাটে যায়, তখন বৌ বলিয়াছিল "জল্‌দি আসিস্, তোর ত আঠারো মাসে বছর।" পাছে বিলম্ব হইলে গালাগালি খাইতে হয়, এই ভয়ে নয়ান যেই তাড়াতাড়ি ঘাটে নামিতে গিয়াছে, অমনই তাহার পা পিছ্‌লাইয়া গেল এবং হাতের বাটীটা তালের গুঁড়ির উপর পড়িয়া একেবারে দুইখানি হইয়া গেল; নয়ানও বিশেষ আঘাত পাইল।

নয়ান তাড়াতাড়ি গা ঝাড়িয়া উঠিয়া দেখে বাটীটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তখন তাহার আঘাতের বেদনার কথা আর মনে থাকিল না; তাহার অপেক্ষাও গুরুতর বেদনা যে আজ তাহার নসিবে আছে, তাহাই ভাবিয়া বালক কাঁদিয়া ফেলিল। বাড়ী যাইতে তাহার সাহস হইল না। সে একবার মনে করিল, এখনকার মত ত পলায়ন করি, তাহার পর যাহা হয়

হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, পলায়ন করিয়া ত সে শাস্তির হাত এড়াইতে পারিবে না ; পলায়ন করিলে হয় ত শাস্তি আরও গুরুতর হইবে। বালক কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া ঘাটের ধারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে তাহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূ চীৎকার করিয়া ডাকিল "ওরে, হাড়হাবাতে, পুকুর ঘাট কি যমের বাড়ী ? এমন বজ্জাত, কুড়ে ছেলেও দেখি নি !"

নয়ান তখন কি করে ! যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে, ভাবিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। তাহার পা দুখানি আর চলে না। যখন সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তাহার ভ্রাতৃবধূ গর্দ্দভনিন্দী স্বরে বলিল "লবাবজাদার আর ঠ্যাং চলে না, পুকুর কি সাতকোশ রে কুড়ে ! দে পাথর বাটী !"

নয়ান মৃদুস্বরে বলিল "পাথর বাটীটা ভেঙ্গে গেছে, আমি পা পিছ্‌লে প'ড়ে গিয়েছিলাম।"

আর যাবে কোথায় ! রাক্ষসী বৌটা একেবারে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ভেঙ্গে গেছে ! ওরে সয়তান, হারাম্‌খোর, বেইমান, কেমন ভেঙ্গে গেছে, দেখাচ্ছি।' এই বলিয়া পরাণের স্ত্রী নয়ানের দিকে ধাবিতা হইল। নয়ান যদি তখন পলায়ন করে, তবে আর তাহাকে প্রহার খাইতে হয় না ; কিন্তু ছেলেটা এতই শান্ত, এতই ভালমানুষ, এতই ভীত যে, বৌয়ের রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। সে কাঠের পুতুলের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরাণের স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া "তবে রে হারামের পুত" বলিয়া সেই বালকের গালে ঠাস্ করিয়া চড় লাগাইল। নয়ান "ও আল্লা, জান গ্যাল" বলিয়া পড়িয়া গেল। রাক্ষসীর তখনও রাগ থামে নাই। সে ঐ মূর্চ্ছিত-

প্রায় ভূপতিত বালককে একটী পদাঘাত করিয়া বলিল "ন্যাকামী দেখ! ওঠ্ বল্‌ছি, নইলে তোর গোস্ত টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌ব।"

নয়ান মূর্চ্ছিত হয় নাই, কিন্তু সেই দৃঢ়হস্তের চড় তাহার বড় লাগিয়াছিল, এবং চড়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া সে পড়িয়া গিয়াছিল। পাছে আরও প্রহার খাইতে হয়, এই ভয়ে সে উঠিয়া বসিল। পরাণের স্ত্রী তখন আজ্ঞা প্রচার করিল "বেরো আমার বাড়ী থেকে। আর যদি এ বাড়ীতে ঢুক্‌বি তাহ'লে তোরে খুনই করে ফ্যাল্‌ব।" বালক নড়িল না। রাক্ষসী আবার গর্জ্জিয়া উঠিল "শিগ্‌গির বেরো, নইলে তোর ভাল হবে না।"

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। চৈত্র মাসের রৌদ্র পৃথিবীময় আগুন ছড়াইয়া দিতেছিল। সেই সময়ে পিতৃমাতৃহীন সাতবৎসরের বালক নয়ান কাঁদিতে কাঁদিতে একবার বৌয়ের মুখের দিকে চাহিল। সেখানে দয়া বা করুণার লেশ মাত্র দেখিতে পাইল না। সে তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তখনও তাহার মুখে জলবিন্দু পড়ে নাই। মা বাঁচিয়া থাকিলে এতক্ষণ তাহার তিনবার আহার হইয়া যাইত। এখন আর তাহার সে দিন নাই! এখন যে তাহার মুখের দিকে চাহিবার লোক নাই! এক বড় ভাই, সে সকল সময় বাড়ী থাকে না; নয়ানের উপর যে অত্যাচার হয়, তাহাও সে জানে না। নয়ানও কোন দিন কোন কথা বৌয়ের ভয়ে দাদাকে বলে নাই।

নয়ান বাড়ীর বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিল,—কোথায় যাইবে। একবার ভাবিল পাশের কোন বাড়ীতে গেলে হয়,—পরক্ষণেই তাহার মনে হইল কাহারও বাড়ীতে গেলেই সে সময় সকল কথা বলিতে হইবে; আর সে কথা বৌয়ের কানে পৌঁছিলে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না। বয়স সাত বৎসর হইলে কি হয়, এই অল্প কয়েক দিনের দুঃখ ও নির্য্যাতন, তাহার

বয়সকে দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিল। সে তখন স্থির করিল, সে কোথাও যাইবে না। বাড়ীর বাহিরে রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় সে বসিয়া থাকিবে। রাগ পড়িয়া গেলে বৌ তাহাকে ডাকিয়া ভাত দিবেই। আর সে যদি নাই ডাকে, তাহার দাদা ত সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসিবে ; তখন সে দুইটা খাইতে পাইবেই। একবেলা না খাইলে ত মানুষ আর মরে না।

নয়ান রাস্তার পার্শ্বে বটগাছের শীতল ছায়ায় ঘাসের উপর শুইয়া রহিল। প্রথম কিছুক্ষণ তাহার বড় ক্ষুধাবোধ হইতে লাগিল ; তাহার পর সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা আসিয়া এই অনাথ শিশুকে কোলে লইয়া বসিলেন। বালক কিছুক্ষণের জন্য মায়ের কোলে স্থান প্রাপ্ত হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরাণ দাখানি হাতে করিয়া শ্রান্তদেহে, ধীর পদবিক্ষেপে যখন বাড়ীর সম্মুখের সেই গাছের নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে দেখিল নয়ান শুষ্কমুখে মলিনভাবে সেই বৃক্ষতলে বসিয়া আছে।

"ওখানে অমন ক'রে বসে আছিস্ যে নয়ানে!" বলিয়া পরাণ সেই স্থানে দাঁড়াইল। তাহার দাদার—আপন মায়ের পেটের ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নয়ানের শোকের সাগর উথলিয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

পরাণ তখন নয়ানের নিকট সরিয়া আসিল, তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "নয়ান, কি হয়েছে ভাই! তুই কাঁদছিস্ কেন? তোর মুখ শুকিয়ে গেছে কেন? তুই কি কিছু খাস্ নি?"

এমন স্নেহের স্বর যে নয়ান অনেক দিন শোনে নাই। পৃথিবীতে এমন কথা বলিবার যে তাহার কেহ আছে, তাহা ত সে জানিত না। নয়ান কাঁদিতে লাগিল। পরাণ তখন তাহাকে নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া লইল, তাহার স্কন্ধের কালো গামছাখানি দিয়া নয়ানের মুখ মুছাইয়া

দিল। তাহার পর অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল "কি হয়েছে, আমাকে খুলে বল্। কেউ মেরেছে? কেউ কিছু বলেছে?"

নয়ান তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; সে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কথা পরাণকে বলিল। বাপমায়ের মৃত্যুর পর হইতে তাহার উপর কি অত্যাচার হইয়া আসিতেছে, তাহা সব বলিল। তাহার পর সেই দিনের ঘটনা, সেই পাথরবাটী ভাঙ্গিবার কথা,—সেই গালাগালির কথা—সেই প্রচণ্ড চড়ের কথা,—সেই লাথির কথা—সেই বেলা দ্বিপ্রহরে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার কথা—সমস্ত কথা নয়ান পরাণকে বলিল। তাহার পর বলিল "ভাইজি, আজ তামাম দিন আমার প্যাটে একটা দানাও পড়ে নেই—একরত্তি জলও না।"

পরাণ এই কথা শুনিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিল; তাহার পর সেই সোনার কনিষ্ঠ, তাহার পিতামাতার সেই আদরের নিধি—যখন বলিল "ভাইজি, আজ তামাম দিন আমার প্যাটে একটা দানাও পড়ে নেই —একরত্তি জলও না।" তখন পরাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল "কি, এত বড় কথা! দেখি গে সে হারামজাদিকে! এত বড় গোস্তাকি তার।"

এই বলিয়া পরাণ পাগলের মত বাড়ীর দিকে দৌড়িল। নয়ান তাহার ভাইজির সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছু পিছু ছুটিল, আর বলিতে লাগিল, "ভাইজি, দাঁড়াও, ভাইজি! ওরে ভাইজি রে!"

পরাণ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই, গর্জ্জন করিয়া বলিল "দেখি, কোথায় সেই হারামজাদি!" এই বলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে গেল;— তাহার হাতে তখনও সেই তীক্ষ্ণধার দাথানি ছিল।

পরাণের চীৎকার শুনিয়া এবং তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার

স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতেছিল ; কিন্তু সে পলায়নের অবকাশ পাইল না। সে যখন দ্বারের নিকট আসিয়াছে, তখন দেখিতে পাইল উন্মত্তের মত পরাণ তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই পরাণ চীৎকার করিয়া বলিল "তবে রে হারামজাদি !" এই বলিয়াই সে বাম হস্তে তাহার স্ত্রীর কাপড়খানি চাপিয়া ধরিল, আর দক্ষিণ হস্তস্থিত দাখানি দ্বারা সজোরে তাহার গলায় আঘাত করিল। এক আঘাতেই হতভাগিনীর ছিন্নমুণ্ড ধরাতলে পড়িয়া গেল, রক্তের ফোয়ারা ছুটিল, পরাণ সেই রক্তে স্নাত হইল। তখনও পরাণের রাগ যায় নাই, ক্রুদ্ধ সিংহের মত তখনও সে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

নয়ান বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখে পরাণের স্ত্রীর মস্তক একস্থানে ও তাহার দেহ আর একস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, রক্তে ঘর ভাসিয়া গিয়াছে, আর তাহার দাদা সেই দা হাতে করিয়া তখনও গর্জ্জন করিতেছে। নয়ান এই দৃশ্য দেখিয়া "ও আল্লা, ওরে ভাইজি !" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

গোলমাল শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। পরাণ তখনও দা হাতে করিয়া সেই স্থানেই কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার পর গ্রামের চৌকীদার, পঞ্চায়েত ও ভদ্রাভদ্র অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হইল। পঞ্চায়েত ও কয়েকজন লোক পরামর্শ করিয়া তখনই চৌকিদারকে থানায় পাঠাইয়া দিল। এত লোকের সমাগম দেখিয়া পরাণ হাতের দাখানি ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। প্রতিবেশীরা নয়ানের চৈতন্য সম্পাদন করিল। তখন এক বৃদ্ধ পরাণকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেল,—পরাণ কোন উত্তরই দিল না, চুপ

করিয়া বসিয়া রহিল। নয়ান শুধু মধ্যে মধ্যে "ও আল্লা, ওরে ভাইজি!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; সকলে নানাপ্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় থানার দারোগা, কনেষ্টবল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি তদন্তের ব্যবস্থা হইতে লাগিল; কিন্তু তদন্ত আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। দারোগা যখন নয়ানকে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পরাণ আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল "বাবুজি, ওকে আর কি জিগেস্ কচ্ছেন। এ খুন আমিই করেছি। আমাকে বেঁধে নিয়ে যান।"

দারোগা বলিলেন "কেন তুমি খুন করলে?" পরাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "সে কথা আর একশবার ব'লে কি হবে; একেবারে জেলার হাকিমের কাছেই সব বলব।" এই বলিয়া পরাণ যে চুপ করিল, তাহার পর আর কেহ তাহাকে কথা বলাইতে পারিল না। দারোগা মহাশয় নয়ানের নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া লাস চালান দিলেন এবং পরাণের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেলেন। নয়ান উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডিপুটী হাকিম যথারীতি সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিয়া পরাণকে সেসন-সোপর্দ্দ করিলেন। পরাণ সেই যে চুপ করিয়াছিল, তাহার পর এ পর্য্যন্ত একটী কথাও বলে নাই। নিম্ন আদালতে গরিব পরাণের পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য কোনও উকিল-মোক্তার উপস্থিত হন নাই।

সেসন আদালতে যখন মোকদ্দমা উঠিল, তখন একজন জুনিয়ার উকিল পরাণের পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি যখন পরাণকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন, তখন

পরাণ সেই প্রথম কথা বলিল ; সে বলিল "বাবুজি, আমার কথা আমিই বল্‌ব, সেলাম !" উকিল বাবু বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলেন।

মোকদ্দমার ডাক পড়িল। হাতকড়িবদ্ধ পরাণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হইল। সরকারী উকিল মাথার শামলাটা ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বসাইয়া একবার গলা ঝাড়িয়া যখন মোকদ্দমার অবস্থা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন পরাণ বলিয়া উঠিল. "ধর্ম্মাবতার, সায়েব, আর কাউকে কিছু বল্‌তে হবে না। যা যা বল্‌তে হবে আমিই হুজুরের কাছে ব'লে যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে তাহার অবস্থার কথা, তাহার পিতামাতার মৃত্যুর কথা, তাহার স্ত্রীর বদ্‌মেজাজের কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর স্বর আরও একটু উঁচু করিয়া সে বলিল "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, সায়েব, কোম্পানী বাহাদুর, আমার পরিবার আমার ঐ ছোট ভাইকে ভাত দিত না, যখন তখন তারে ধ'রে মারত। আমি জন খাটি, তামাম দিন পয়সার ধান্দায় ঘুরি ; ঘরে কি হয় না হয়, তার কি খবর আমি রাখ্‌তি পারি ? যে দিন খুন হয়, সেদিন ধর্ম্মাবতার, আমি মজুরী করে সারাদিনে সাতটা পয়সা কামাই করে ঘরে যাতিছিলাম ; মেজাজটা বড়ই খারাপ ছিল। বাড়ীর সুমুকে গাছতলায় দেখি নয়ান ব'সে আছে। তার মুখ শুকিয়ে গেছে—আমারে না দেখে সে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতি লাগ্‌ল। হুজুর, আমাদের বাপ মা নেই, আমার ঐ একটা ভাই। তার কান্না দেখে আমার পরাণের মদ্দি কেমন করে উঠ্‌ল। আমি গামছা দিয়ে তার মুখ মোছায়ে দেলাম ; তারে দুইটা মিষ্টি কথা বল্‌লাম। সে তখন বল্‌ল কি, যে একটা পাথরের খোরা নিয়ে সে ঘাটে গিছ্‌ল্‌ ; ঘাট পিছল ছিল। নয়ানে সেই ঘাটলায় পা পিছ্‌লে পড়ে গিছলো ; হাতের খোরাটা প'ড়ে একবারে চৌচির হয়ে গেল। তাই না শুনে, আমার পরিবার নয়ানকে ঠাস্‌ করে একটা চড় দিল। ভাই আমার সেই চড়

খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল। তাতেও কি সে তারে ছাড়ে, তার উপর ধর্ম্মাবতার, লাথি— লাথি সায়েব, লাথি—" পরাণের চক্ষু রাগে জ্বলিয়া উঠিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আদালতশুদ্ধ লোক, জজ সাহেব প্রভৃতি হাঁ করিয়া পরাণের কথা শুনিতে লাগিলেন।

জজ সাহেব পরাণকে চুপ করিতে দেখিয়া বলিলেন "ওয়েল, গো অন। তারপর।"

পরাণ তখন সামলাইয়া লইয়াছে। পরাণ বলিতে লাগিল "তার-পর হুজুর, তারপর। তারপর নয়ান বল্‌ল, আমার পরিবার এই চৈত্তির মাসের দুপুর রোদ্দুরে নয়ানকে বাড়ী থিকে বা'র করে দেল। ছাওয়াল মানুষ, তখনও তার প্যাটে একটা দানা পড়ে নেই—হজুর এট্টা দানা পড়ে নেই। এতটুকু ছাওয়ালডার মুখে তখন একরত্তি জলও পড়ে নেই। আমার জন্যি তামাম দিন সে পথে বসে ছিল। হুজুর সাত বছরের ভাই আমার তামাম দিন কিছু খায় নেই, জলটুকুও না হুজুর! ধর্ম্মাবতার, কোম্পানী বাহাদুর, তোমারও ভাই আছে হুজুর! তোমার এতটুকু ছোট ভাইকে যদি তোমার মেমসাহেব না খাতি দিয়ে এই চৈত্তির মাসের দুপুর বেলায় বাড়ী থিকে বার কোরে দিত, আর তামাম দিন খবর না নিত, তা হ'লে তুমি সে পরিবারেরে কি কোরতে হুজুর! তোমার পরাণ-ডার মদ্দি তখন কেমন করে উঠ্‌ত হুজুর! এতটুকুখানি ছাওয়াল, মা নেই বাপ নেই, তারে কুকুরডার মত এই দুপুর রোদ্দুরে বাড়ির বা'র করে দিল। ধর্ম্মাবতার, তুমিই বল, আল্লার কিরে, তুমিই বল হুজুর, এমন পরিবারেরে তুমি কি ক'রতে? সাতটা না পাঁচটা না, একটা ভাই; তারে কিনা তাড়ায়ে দিল, একটা দানা দিল না, লাথি মারলো; হুজুর, লাথি মারলো। তুমিও যা কোরতে, আর দশজনেও যা করতো, আমিও তাই করিছি। এমন পরিবারেরে খুনই কোরতিই হয়। তার জান

নিতিই হয়। ধর্ম্মাবতার, কোম্পানীর আয়েনে খুনির বদলে খুন নিতি হয়। তাই হোক। তাই হোক।" এই বলিয়া পরাণ চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জজসাহেবের মন গলিয়া গিয়াছিল; তিনি অনুচ্চ স্বরে পরাণকে বলিলেন "তুমি কি চাও পরাণ মণ্ডল?"

পরাণ বলিল "হুজুর, একবার নয়ানের মুখখানি জন্মের মত দেখ্‌তি চাই হুজুর, একবার তারে বুকির মদ্দি জড়ায়ে ধরতি চাই।"

জজ সাহেব তখনই নয়ানকে সেখানে আনিবার জন্য হুকুম দিলেন। নয়ান আসিয়া যখন কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন পরাণ তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল; কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর জজ সাহেবের দিকে চাহিয়া পরাণ বলিল "হুজুর, আমার এই ভাইডারে কার হাতে দিয়ে যাব? আমি এরে কোম্পানী বাহাদুরের হাতে দিয়ে গ্যালাম। ভাই নয়ান, তোরে আজ আমি কোম্পানী—সায়েবের হাতে দিয়ে গ্যালাম ভাইরে—" পরাণ আর কথা বলিতে পারিল না, চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ধর্ম্মাবতার জজ বাহাদুরও এই দৃশ্য দেখিয়া রুমালে চক্ষু মুছিলেন।

তাহার পর জজ সাহেব বলিলেন "এ মামলার আর সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। আসামী কবুল করিয়াছে।" জজসাহেব জুরীদিগের দিকে চাহিলেন; জুরীগণ একবাক্যে বলিলেন "আসামী অপরাধ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উপর লঘু দণ্ড প্রদানের জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।" জজ সাহেব তখন বলিলেন "আমি আসামী পরাণ মণ্ডলকে এক বৎসরের মেয়াদের হুকুম দিলাম।"

জজ সাহেবের রায় শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। সকলে

ভুলিয়া গেল যে, তাহারা আদালতগৃহে উপস্থিত। তখন সেই জনসংঘ একযোগে জয়ধ্বনি করিল। জজ সাহেব বাধা দিলেন না।

কনেষ্টবলেরা যখন পরাণকে কাঠগড়া হইতে নামাইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন জজ সাহেব আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন "পরাণ মণ্ডল, তোমার ভাই আজ হইতে আমার কুঠীতে থাকিবে।"

পরাণ জজ সাহেবের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দক্ষিণ হস্তখানি তুলিল।

শান্তিরাম।

চারিবৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন আমি বি এ পাশ করিয়া এম, এ ক্লাসে পড়ি। সেই সময়ে আমি যে আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহার ক্ষত এখনও শুকায় নাই—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শুকাইবে না। যে দিন আমার নাম চিরকালের জন্য লোপ পাইবে, সেই দিন আমার আঘাতের বেদনা ঘুচিবে—সেই দিন আমি শান্তি লাভ করিব।

ঘটনাটা চারি বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহারও পূর্ব্বের কথা কয়েকটি না বলিলে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের দুঃখ-কাহিনী কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তাই আমার ছাত্র-জীবনের কথা অতি সংক্ষেপে বলিতে হইতেছে।

আমার বাড়ী পাবনা জেলায়। আমরা ব্রাহ্মণ। আমার পিতা সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের একজন বড় জমিদার। এতদ্ব্যতীত, আমাদের পাটের কারবারও আছে। বলিতে গেলে জমিদারীর আয় অপেক্ষা পাটের ব্যবসায়ের আয়ই আমাদের অধিক। তবে কারবারের আয় অস্থায়ী, জমিদারীর আয় এক প্রকার বাঁধা বলিলেই হয়।

আমি পিতার একমাত্র সন্তান,—তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর ও বৃহৎ কারবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমার পিতা কর্ণওয়ালিশের দশশালা বন্দোবস্তের আদর্শ ছিলেন না; তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন; বি এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবার পর তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করেন এবং বিষয়কর্ম্ম দেখিতে আরম্ভ করেন। পিতামহের মৃত্যুর

পর সেই জন্য তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম লইয়া বিশেষ বিব্রত হইতে হয় নাই। তাহার পর তিনিই পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় তাহাতে লাভবান্‌ও হইতে থাকেন।

পিতা লেখাপাড়ার আদর জানিতেন, তাই তিনি আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি সামান্য কাজ চালাইবার মত লেখাপড়া শিখিয়া মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমারও বিলাসের দিকে মন ছিল না, লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমারও আগ্রহ ছিল; অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের জন্য আমার যত্ন চেষ্টার ত্রুটী ছিল না! আমি আমাদের গ্রামের বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দশটাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আমাকে পড়িবার জন্য কলিকাতায় যাইতে হইবে, এই ভাবনায় আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর! পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া বিদেশে বাস করিতে হইবে, ইহা আমার চিন্তার কারণ নহে। যদিও কোন দিন পিতামাতাকে ছাড়িয়া বিদেশে বাস করি নাই, কিন্তু লেখাপড়া শিখিবার জন্য যে আমাকে বিদেশে যাইতে হইবে, আমার জন্য যে সিরাজগঞ্জের পাটের আড়তে কলেজের প্রতিষ্ঠা হইবে না, তাহা কি আর আমি ষোল বৎসর বয়সেও বুঝিতে পারি নাই? সে কথা নহে। আমার রীতিনীতি আচার ব্যবহারটা একটু সেকেলে রকমের; অর্থাৎ উপবীত গ্রহণের পর হইতেই আমি উপবীতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কি জানি কেন বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। আমি যথারীতি সন্ধ্যা গায়ত্রী করিতাম, আমি যথারীতি একাদশী করিতাম, আমি জুতা পায়ে জল

খাইতাম না, আমি স্নান আহ্নিক শেষ না করিয়া কোন দিন আহার করিতাম না। ব্রাহ্মণের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। কেন আমার মাথার মধ্যে এ ইচ্ছা প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। বাড়ীতে বাবা মা যে খুব হিন্দু ছিলেন, তাহাও বলিতে পারি না। আজ-কাল যে সমস্ত আচার-ব্যবহার আমাদের হিন্দুপরিবারে, ব্রাহ্মণ-পরিবারে চলিত হইয়া গিয়াছে, বাবা মা সেই ভাবেই চলিতেন; বিলাতী বিস্কুট, সোডা, লিমনেড, জ্যাম, জেলি সকলই আমাদের গৃহে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। উপবীত গ্রহণের পূর্ব্বে আমিও সে সকল ব্যবহার করিতে কোন দিন কোন দ্বিধা বোধ করি নাই। কিন্তু তের বৎসর বয়সের সময় আমার যখন উপনয়ন হইল, আমি যখন শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের পদবীতে উন্নীত হইলাম, তখন আমার মনে হইল যে, আমি শাস্ত্রানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া, যাগ যজ্ঞ করিয়া যে ব্রত অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, তাহা ছেলেখেলা নহে। উপবীতের মর্য্যাদা আমাকে রাখিতে হইবে, শাস্ত্রের অনুশাসন আমাকে মানিয়া চলিতে হইবে। কেন এ ভাব আমার মনে হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না;—তখনও পারি নাই, এখনও পারি না।

প্রথম প্রথম আমাকে ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার করিতে দেখিয়া বাবা মা উভয়েই মনে করিয়াছিলেন যে, উপবীত গ্রহণের পর ছেলেদের প্রথমে ঐ রকম একটা ইচ্ছা হইয়া থাকে; সুতরাং তাঁহারা আমার ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি দেখিয়া এবং আমার আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আনন্দই অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, আমি ও-সকল ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ করিতেছি না, বরঞ্চ আমার নিষ্ঠা ক্রমেই বাড়িতেছে, তখন তাঁহারা অনেক সময়ে আপত্তি করিতেন।

বাবা ত স্পষ্টই বলিতেন যে, স্নানপূজা সন্ধ্যা গায়ত্রীতে যে সময় যায়, সে সময়টা পড়াশুনায় দিলে অধিক কাজ হয়; লেখাপড়ার সময় ও-সব সাজে না। লেখাপড়া শেষ করিয়া, সংসারধর্ম্ম শেষ করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মাচরণ, পূজা, অর্চ্চনা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি পালন করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার এ যুক্তি, এ উপদেশ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই! যদি সন্ধ্যা গায়ত্রী না করিলাম, যদি ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার না রক্ষা করিলাম, তাহা হইলে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলাম কেন? ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিই কেন?

একদিন আমার মাতুল আমাকে বলিয়াছিলেন, "নরেন, তুই যে এত বামুনগিরি করিস্, তবে ইংরেজি লেখাপড়া করিস্ কেন? ম্লেচ্ছভাষা শিখিস্ কেন?"

আমি তখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। আমি বলিলাম, "ভাষা আবার ম্লেচ্ছ কি? জ্ঞান কি সীমাবদ্ধ? সকল ভাষাকেই জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া লইতে হয়। আমি বাঙ্গালা পড়ি, সংস্কৃত পড়ি, ইংরেজিও পড়ি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি আমার গণ্ডী ছোট করিব কেন? আমি ইংরেজি যত-দূর পারি পড়িব। তাতে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইবে না।"

এই সময় আমি মৎস্য মাংস আহার ত্যাগ করিলাম। বাবা মা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন; মাছ মাংস আহার ত্যাগ করিলে আমার শরীর নষ্ট হইয়া যাইবে, আমি লেখা পড়া করিতে পারিব না, আমি ভয়ানক রোগে পড়িব। আমি তাঁহাদের আদেশ, উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমি ইচ্ছা করিয়া মৎস্য মাংস আহার ত্যাগ করি নাই; কি জানি কেন আমিষ দ্রব্যের উপর আমার ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। আমার মাতুল আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "তুই যে দেখ্‌ছি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হলি।"

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কেন আমার চিন্তা হইয়াছিল, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিলেন। কলিকাতায় পড়িতে গেলে আর আর ছেলেদের সঙ্গে মেসে অথবা হিন্দু হষ্টেলে থাকিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার উঠাবসা করিতে হইবে। তাহা ত আমার দ্বারা কিছুতেই হইবে না। আমি শুনিয়াছি, কলিকাতার স্কুল কলেজের ছেলেরা যে সকল মেসে বা হষ্টেলে থাকে, সেখানে তাহারা জাতীয় আচার-ব্যবহার মানিয়া চলে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, মেসে কি হষ্টেলে গোঁড়ামি রক্ষা করিয়া চলা যায় না; তবে অখাদ্য না খাইলেই হইল। ইচ্ছা হয় সন্ধ্যা গায়ত্রী কর, কিন্তু আসন পাতিয়া আয়োজন করিয়া শুদ্ধশান্ত হইয়া ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান সে সকল স্থানে একেবারেই অসম্ভব! আরও এক কথা শুনিয়াছি যে, কলেজের এত পড়ার চাপ পড়িয়া থাকে যে, ঐ সকল বাজে কাজে সময় নষ্ট করিবার উপায় থাকে না। এ কথাটা আমি মানি না। ইচ্ছা থাকিলে সময়ের অভাব হয় না এবং সন্ধ্যা গায়ত্রীতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহা একটু পরিশ্রম করিয়া পোষাইয়া লওয়া যায়। কিন্তু আমার প্রধান প্রতিবন্ধক আচার-অনুষ্ঠানের অসুবিধা। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আমি বিশেষ চিন্তায় পড়িয়াছিলাম।

আমি সেই সময় একদিন বাবাকে বলিলাম যে, কলিকাতায় গিয়া আমি কোন মেসে বা হষ্টেলে থাকিতে পারিব না। বাবাও সে কথা ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কি করিবেন, তাহা তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে কি ব্যবস্থা করা যায়?" আমি বলিলাম, "আমি একটা পৃথক বাসা করিয়া থাকিতে চাই।" বাবা বলিলেন, "একেলা একটা বাসা করিয়া তুমি ছেলেমানুষ কেমন করিয়া থাকিবে? অবশ্য খরচের কথা ভাবিতেছি না; মাসে না হয় তোমার লেখাপড়ার জন্য একশত

টাকাই খরচ হইবে। তাহা আমি দিতে পারিব ; কিন্তু কলিকাতা সহরে অভিভাবকহীন অবস্থায় তোমার মত ছেলেমানুষের একেলা থাকাটা অসম্ভব। এমন কে আছে যে, যাহার হাতে তোমাকে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "কেন, শান্তিদাদা।"

বাবা বলিলেন, "শান্তিকাকা কি দেশ ছেড়ে তোমাকে নিয়ে কল্‌কাতায় থাক্‌তে স্বীকার হবে ?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই হবে। তাকে আমি বলেছিলাম ; সে তাতে খুব সম্মত। বুড়ো মানুষ, গঙ্গাতীরে থাক্‌বে, কাজকর্ম্ম বেশী নেই। তারপর সে আমাকে যে ভালবাসে, তার কাছে আমি খুব থাক্‌তে পারব।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি তা ঠিক ক'রে থাক, আর শান্তি-কাকা যদি যেতে চায়, তবে ত ভালই হয়! তা হলে আমি সত্যসত্যই তার হাতে তোমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি! বেশ, তাই হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে কল্‌কাতায় গিয়ে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে দিয়ে আস্‌ব! একটা রাঁধুনী বামুন আর একটা চাকরও ঠিক ক'রে দিতে হবে ; শান্তিকাকা ত সব কাজ করতে পারবে না। বুড়া মানুষ কিছুদিন বিশ্রামই করুক। আমি তাই ঠিক করছি!"

এইস্থানে শান্তিদাদার একটু পরিচয় দিই। সে আমার আত্মীয় বা কুটুম্ব নয় ; কিন্তু সে আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব অপেক্ষাও আপনার জন ; সে আমার পিতামহের গৃহদেবতা,—সে আমাদের শান্তিদাদা। সে বাবাকে মানুষ করিয়াছে, আমাকে মানুষ করিয়াছে, আমার মাকে আনিয়া নয়বৎসর বয়সের সময় এই বাড়ীতে গৃহিণীপনা শিখাইয়াছে ;—সে আমার বাবার শান্তিকাকা—সে আমার শান্তিদাদা!

তার নাম শান্তিরাম ঘোষ। আমার পিতামহ তাহাকে রংপুর হইতে

আনিয়াছিলেন। শান্তিদাদার বিবাহ না কি হইয়াছিল। আমাদের এখানে থাকিতেই তাহার বিবাহ হয়। আট নয় বৎসর পরে তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়, সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তাঁহার পর সে আর বিবাহ করে নাই। এ সকল আমার জন্মের পূর্ব্বের কথা। শান্তিদাদা আমাদেরই একজন। আমি ছেলেবেলায় তাঁহার সঙ্গে বসিয়া না কি ভাত খাইয়াছি। কায়স্থ হইলে কি হয়—সে যে আমার পিতামহের মত।

শান্তিদাদার গুণের কথা কি বলিব! বলিয়াছি ত সে আমাদের গৃহদেবতা। তাহার অনুমতি না লইয়া মা কোন কাজ করিতেন না। কোন মঙ্গল অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহার আশীর্ব্বাদ আমরা সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করিতাম! কাজকর্ম্মের কথা থাকুক, শান্তিদাদার আর একটা মহৎ গুণ ছিল, সে বড় সুন্দর গান করিতে পারিত। তাহার গান শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। সে যখন নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গাইত—

"মন তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা।"

তখন যে সেই গান শুনিত, সেই তন্ময় হইয়া যাইত। সে যখন গায়িত—

"নন্দি! গিরিনন্দিনী—ত্রিনয়নের-নয়নতারা।
তারাহারা হয়ে আমি আজ, হয়েছি রে
তারাহারা।"

তখন পাষাণের চক্ষেও জল আসিত। আমি ত তখন আমার চক্ষের সম্মুখে সেই সতী-শোকাতুরা পাগল ভোলানাথকে দেখিতে পাইতাম; তাঁহার সেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, সেই মর্ম্মস্পর্শী করুণবিলাপ আমার

প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিত! আমি বৃদ্ধ শান্তিদাদার বুকে মুখ লুকাইয়া সতীশোকে পাগল বিশ্বেশ্বরের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতাম। আমার এক এক সময়ে মনে হইত, শান্তিদাদার কাছে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, তাহাই আমার জীবনপথের আপার্থিব পাথেয়। আর তাহার পর—ওগো, সেই কথা বলিবার জন্যই ত,—সেই মর্ম্মভেদী কাহিনী বলিবার জন্যই ত—আমার ছাত্রজীবনের দুই একটা কথা বলিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারে গঙ্গাতীরে আমরা একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিলাম। এ স্থান হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজ অনেক দূর বলিয়া বাবা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু শান্তিদাদা যখন বলিলেন, "এই স্থানই ভাল; বুড়ো মানুষ, রোজ গঙ্গাস্নান ক'রে কৃতার্থ হব।" তখন বাবা আর আপত্তি করিলেন না। তিনি একটি রাঁধুনী বামুন ও একটি চাকর নিযুক্ত করিয়া দিয়া এবং আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। আমি আমার ছাত্রজীবনের দীর্ঘ পাঁচ বৎসর এই বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলাম। বুড়া শান্তিদাদা আমার অভিভাবকরূপে বাস করিত।

শান্তিদাদা এই বুড়া বয়সে কলিকাতায় আসিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। আমার বামুন ঠাকুর কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিত; শান্তিদাদা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার নিকট হইতে বাঙ্গালা শিখিয়া ফেলিয়াছিল এবং সে রামায়ণ মহাভারত অনর্গল পড়িয়া যাইতে পারিত। অবসর-সময় কাটাইবার এই উপায় পাইয়া বুড়া বড়ই শান্তিলাভ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে তাহার দুই একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু আমার এত অধিক সময় ছিল না যে, তাহাকে সংস্কৃত শিখাই। তবে তাহার পাঠের জন্য আমি শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি আনিয়া দিয়াছিলাম। সে তাহার

বাঙ্গালা অনুবাদ মোটেই পড়িত না, সংস্কৃত শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিত। আমি একদিন তাহাকে বলিলাম "শান্তিদাদা! তুমি যে এই সব শ্লোক মুখস্থ কর, আর আওড়াও, ইহার অর্থ ত তুমি মোটেই বোঝ না; তবে এ সব প'ড়ে ও মুখস্থ ক'রে তোমার কি হয়?" শান্তিদাদা এ কথার যে উত্তর দিয়াছিল, তেমন উত্তর আমি কোন দিন শুনি নাই। সে বলিয়াছিল, "এ সকল দেবতার মুখের কথা; উচ্চারণ করলেই মুক্তিলাভ হয়। ও কি মানুষে বুঝ্‌তে পারে। আমি যখন ঐ সকল মন্ত্র পড়ি, তখন আমার জ্ঞান থাকে না, আমি এ দেশেই থাকি না।"

একদিন আমি ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সে দিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার তীরে ভ্রমণ শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া দেখি শান্তিদাদা তারস্বরে আবৃত্তি করিতেছে,—

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽন্যাদি কর্ত্তে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতি স্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে!

আমি স্থির নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া শান্তিদাদার এই সুন্দর আবৃত্তি শুনিতে লাগিলাম। অনেকের মুখে আবৃত্তি শুনিয়াছি, অনেক পণ্ডিতের মুখে গীতার এই শ্লোক শুনিয়াছি; কিন্তু এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী আবৃত্তি আমি কখন শুনি নাই। আর তাহা আবৃত্তি করিতেছে কে? যে সংস্কৃত জানে না, যে ঐ মহান্ বাণীর অর্থগ্রহ করিতে পারে না,—সেই আমার শান্তিদাদা ঐ অপার্থিব শ্লোকগুলির আবৃত্তি করিতেছে। ইচ্ছা হইল ব্রাহ্মণসন্তান আমি, ঐ শান্তিদাদার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া জীবন পবিত্র করি। চাহিয়া দেখিলাম, শান্তি-দাদার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছে। ধন্য শান্তিদাদা! ধন্য তাহার সাধনা!

আর একদিনের কথা বলি। রাত্রি তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। আমি শয়ন করিয়াছি। এমন সময়ে শান্তিদাদার সুমধুর কণ্ঠস্বরে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শান্তিদাদা তখন বারান্দায় বসিয়া গান করিতেছে। আমি একমনে শুনিতে লাগিলাম, শান্তিদাদা গায়িতেছে,—

অরূপের রূপের ফাঁদে, প'ড়ে কাঁদে
প্রাণ যে আমার দিবানিশি।
কাঁদ্‌লে নির্জ্জনে ব'সে, আপনি এসে,
দেখা দেয় সে রূপরাশি;
সে যে কি অতুল্যরূপ, নয় অনুরূপ
শত শত সূর্য্য শশী!
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে
সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি;
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়,
ঝলক লাগে হৃদে আসি।

হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি,
চিরদিন সেই রূপশশী ;
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে
কুবাসনা মেঘরাশি !
কাঙ্গাল কয়, যে জন মোরে দয়া ক'রে,
দেখা দেয় রে ভালবাসি ; .
আমি যে সংসার-মায়ায় ভুলিয়ে তাঁয়
প্রাণ ভ'রে কৈ ভালবাসি ।

এই গানটী গায়িতেছে, আর শান্তিদাদা কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। আমি আর বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলাম না ; ধীরে ধীরে বারান্দায় যাইয়া শান্তিদাদার কোলে মাথা দিয়া শয়ন করিলাম। দাদা আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, আর গায়িতে লাগিল,—

"আমি যে সংসার মায়ায় ভুলিয়ে তাঁয়
প্রাণ ভ'রে কৈ ভালবাসি।"

তোমরাই বল আমার এই শান্তিদাদা মানুষ না দেবতা ! আমি তাহাকে কোন দিনই চিনিতে পারিলাম না, একদিনও ধরিতে পারিলাম না। সুধুই জানিতাম—সে আমার শান্তিদাদা !

তাহার কথা কত বলিব—বলিয়া সে কথা শেষ করিতে পারিব না ; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার কথা বলিলেও যে ফুরাইবে না।

এখন সেই দুর্দ্দিনের কথা বলিতেছি। এই যে সে বৎসর পূজার সময় বড় ঝড় হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের কথা বলিতেছি। আমি শান্তিদাদাকে বলিলাম যে, এবার পূজায় বাড়ী যাইয়া কাজ নাই ; পরীক্ষার বৎসর, বাড়ী গেলেই কয়েকদিন পড়াশুনা বন্ধ থাকে। শান্তিদাদা বলিল,

"আরে ভাই, তা কি হয়! পূজার সময় বাড়ী যাওয়া বন্ধ রাখিলে কি চলে? তুমি না গেলে যে পূজাই হবে না। চল যাই, না হয় পূজার কয়দিন পরেই আবার চলিয়া আসিব।"

শান্তি দাদার আদেশ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার ছিল না। বাড়ীতে পত্র লিখিলাম। বাবা যথাসময়ে নগরবাড়ী ষ্টীমার ষ্টেসনে নৌকা পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। আমাদের বাড়ী পাবনা জেলায়, কিন্তু যাইতে হয় এক রকম পৃথিবী ঘুরিয়া। প্রথমে রেলে গোয়ালন্দ যাইতে হয়, সেখানে হইতে ষ্টীমারে চড়িয়া নগরবাড়ী যাইতে হয়; সেখান হইতে নৌকাযোগে দুই প্রহরের পথ গেলে, তবে বাড়ী পৌঁছিতে পারা যায়।

যে দিন আমরা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম, সে দিন কলিকাতায় খুব বৃষ্টি হইতেছিল, বাতাসও একটু প্রবলবেগে বহিতেছিল। শান্তিদাদা বলিল, "আজ গিয়ে কাজ নেই, একটু খোলসা হোক, তখন যাওয়া যাবে।" সেদিন পঞ্চমী—আর একদিন পরেই পূজা। আমি বলিলাম, "আজ না গেলে কি পূজা শেষ হ'লে যাব? ভয় কি শান্তিদাদা, আমরা পদ্মাপারের লোক, আমাদের কি এই দুর্য্যোগ দেখে ভয় আছে।" শান্তিদাদা হাসিয়া বলিলেন, "আমার ত ভয় নেই ভাই, আমার কাছে যে অমূল্যরত্ন রয়েছে, তারই জন্য ভয় করি।"

আমার আগ্রহ দেখিয়া শান্তিদাদা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ঝড়ও হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে গোয়ালন্দে পৌঁছিয়া দেখি ঝড়ে গোয়ালন্দকে একবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছে। সে এক ভীষণ দৃশ্য!

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তখন একখানি ছোট ষ্টীমার জগন্নাথগঞ্জ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; তিনদিন পরে এই ষ্টীমার যাইতেছে। আমরা তাড়াতাড়ি সেই ষ্টীমারে উঠিলাম; তখন বৃষ্টি কম হইয়াছে,

ঝড়ের বেগও কমিয়া আসিয়াছে। আমরা মনে করিলাম আর ভয় ঝড় হইবে না।

আমাদের ষ্টীমার প্রায় বারটার সময় নগরবাড়ী পৌঁছিল। আমরা দুইজনে জিনিষপত্র লইয়া অতি কষ্টে তীরে নামিলাম; কিন্তু আমাদের নৌকার কোন সন্ধানই মিলিল না। ঘাটে তিনচারিখানি নৌকা ছিল; তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান পাইলাম না। শান্তিদাদা বলিল, "ভাড়াটে নৌকায় গিয়ে কাজ নাই; আজ এখানেই থাকা যাক্। বাড়ীর নৌকা নিশ্চয়ই এসে পৌঁছিবে। বোধ হয় তারা ঝড়ে রাস্তায় আট্‌কে গিয়েছে।" আমি শান্তিদাদার এ কথা শুনিলাম না; আমি বলিলাম, "হ্যাঁ; বাড়ীর কাছে এসে তিনদিন ব'সে থাকি। না শান্তিদাদা, তা হবে না। তুমি নৌকা দেখ।"

নিতান্ত অনিচ্ছায় শান্তিদাদা একখানি পানসী নৌকা ভাড়া করিল। নৌকার মাঝিমাল্লা সকলেই মুসলমান, সুতরাং নৌকায় রান্নার ব্যবস্থা আর করা গেল না; আমরা সামান্য কিছু জল খাইয়া লইলাম। তাহার পর জিনিষ পত্র নৌকায় তুলিয়া দিলাম। আমরা যখন নৌকা ছাড়িলাম তখন অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা।

নগরবাড়ী হইতে ক্রোশখানেক পথ যাইতে না যাইতেই পশ্চিম দিক অন্ধকার করিয়া একখানি মেঘ হঠাৎ উঠিয়া আসিল। মাঝি বলিল, "বাবুজি, ঐ ম্যাঘডার গতিক বড় ভাল ঠ্যাক্‌চে না।"

এই কথা শুনিয়াই শান্তিদাদা তাড়াতাড়ি নৌকার বাহিরে গেল, আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। শান্তিদাদা বলিল, "ও মাঝি, মেঘখানা যে বেড়ে উঠ্‌ল। এখন উপায়!"

মাঝি বলিল, "বাঁয়ে 'কাছাড়', নৌকা ত রাখার ঠাঁই নেই। কি করি, হাওয়াও যে মুখোড় আস্‌ল।" বলিতে বলিতেই জোরে বাতাস বহিল,

মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। আমরা তখনও পদ্মা ছাড়িয়া ছোট নদীতে প্রবেশ করিতে পারি নাই। পদ্মা তখন উন্মাদিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ উঠিতে লাগিল। শান্তিদাদা আমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, আর তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মা দুর্গে, রক্ষা কর—রক্ষা কর মা!"

মাঝিমাল্লারা অতুল বিক্রমে ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু সকলই বৃথা হইল। হঠাৎ নৌকার হাল ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি ঘুরিয়া গেল এবং দ্রুতবেগে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল।

শান্তিদাদা তখন চীৎকার করিয়া বলিল, "ভাই, আর না এস।" এই বলিয়াই বৃদ্ধ আমাকে বুকে করিয়া সেই ভীষণ পদ্মার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তখন আর এক বিপদ হইল। আমাদের নাকে মুখে জল যাইতেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার মত হইতেছে, আমরা কিছুতেই জলের উপর থাকিতে পারিতেছি না। শান্তিদাদার শরীরে শক্তি কম ছিল না, আমিও খুব শক্তিমান ছিলাম। কে কাহাকে আশ্রয় করিবে, কে কাহার হাতে আত্মসমর্পণ করিবে? শান্তিদাদাও আমাকে টানিতে লাগিল, আমিও তাহাকে টানিতে লাগিলাম। শেষে আমরা দুইজনেই অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। তাহার পর সব অন্ধকার—!

যখন আমার জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন দেখিলাম আমি একটা চরের উপর পড়িয়া আছি। আমার শরীরের অধিকাংশ বালুকার মধ্যে সমাহিত রহিয়াছে! কথা বলিবার শক্তি অপহৃতপ্রায়! আমি সেই অবস্থাতেই মাথা তুলিয়া ডাকিলাম, "শান্তিদাদা!" তাহার পরেই আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

গভীর রাত্রিতে আমার পুনরায় চেতনাসঞ্চার হইল; আমি উঠিয়া বসি-

লাম ; আমার শরীরে যেন একটু বল আসিল। এমন সময় দূরে কোন গতিশীল নৌকার দাঁড় ফেলার শব্দ পাইলাম। মেঘে সমস্ত অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। বার বার চীৎকার করিতে করিতে শুনিলাম যে নৌকা হইতে কাহারা সাড়া দিল। তখন একটু আশ্বস্ত হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই একখানি নৌকা হইতে একটি ভদ্রলোক লাফাইয়া পড়িলেন। আমি চাহিয়া দেখিলাম—আমার বাবা।

আমি তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"শান্তিদাদা!" তাহার পরই অচেতন হইয়া পড়িলাম।

যখন আমার জ্ঞানসঞ্চার হইল তখন দেখিলাম আমি আমাদের বাড়ীতে একটা বিছানায় শয়ন করিয়া আছি। আমার পার্শ্বে আমার স্নেহময়ী জননী বসিয়া আছেন। আমি মাকে দেখিয়াই অতি ধীরস্বরে বলিলাম "শান্তি দাদা!"

মা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "বাবা কথা বোলো না, এখন চুপ ক'রে থাক। কথা বল্‌লে শরীর আবার অবশ হবে।"

মায়ের কথা শুনিয়া আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন ধীরে ধীরে সকল কথা আমার মনে পড়িল ; আমি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম!

পরে শুনিলাম আমি দশদিন অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম। পাবনা হইতে সিবিল সার্জ্জনকে আনিতে হইয়াছিল। অনেক দিন রোগ ভোগের পর আমি সুস্থ হইলাম। সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু সে আমি আর থাকিলাম না। দিন রাত্রি সুধু পদ্মার ভীষণ কল্লোল আমার কর্ণে ধ্বনিত হইত। আমি পড়াশুনা ত্যাগ করিলাম। বাড়ীতেই বসিয়া থাকি ; কোন কাজেই মন লাগে না।

তাহার পর—তাহার পর এই কয় বৎসর চলিয়া গেল। শান্তিদাদার কথা আমার প্রতিদিন মনে হয়। আমি পড়াশুনা ত্যাগ করিয়াছি। আমি স্থির করিয়াছি, যে কয় দিন বাবা মা বাঁচিয়া আছেন, সে কয়দিন ঘরে থাকিব। তাহার পর দেখিব রাক্ষসী পদ্মা আমার শান্তিদাদাকে ফিরাইয়া দেয় কি না? তাহার পর দেখিব আমার শান্তিদাদাকে সে কোন্ অতলগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছে? সকলে বলে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। তাহারা কি বুঝিবে, আমার কি রত্ন পদ্মায় ডুবিয়া গিয়াছে!—সে যে আমার পারের কাণ্ডারী। এখনও দিবানিশি তাহার সেই গান আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়—

"ওগো, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল
পার কর আমারে।"

পয়লা বৈশাখ।

এই বৈশাখমাসটা আমার বড়ই স্মরণীয় মাস। হিন্দু বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া আমি একথা বলিতেছি না ; বৈশাখমাসের সঙ্গে আমার অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক বিয়োগযন্ত্রণার সম্বন্ধ আছে। এই বৈশাখ মাসে আমি যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর কখনও ফিরিয়া পাইব না ; এই বৈশাখ মাসে যাহাদিগকে শ্মশান-শয্যায় রাখিয়া আসিয়াছি, তাহারা আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল, তাহারা আমার বড়ই আপনার জন ছিল। তাই—এই বৈশাখ মাসের কথা মনে হইলেই, এই বৈশাখমাস আসিলেই আমি শিহরিয়া উঠি ;—ভাগ্যদেবতা আমার অদৃষ্টে আর কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া শঙ্কিত হই।

আবার এই বৈশাখমাসেই—এই বৈশাখের প্রথম দিবসেই—বহুদিন পূর্ব্বে আমি যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাও আর এ জীবনে পাইব না। শোকের কথা, দুঃখের কথা, বিয়োগযন্ত্রণার কথা, যখন তখনই বলিয়াছি, এই সুদীর্ঘ জীবনকাল ভরিয়াই বলিয়াছি, এখনও বলিয়া থাকি ; কিন্তু বৈশাখমাসের প্রাপ্তির কথা আমি ইতঃপূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই। সকল কথাই কি সকলে সকল সময় বলে,—না, বলিবার ইচ্ছাই হয় ; জীবনের অনেক কথা অনেকে গোপন রাখিয়াই চলিয়া যান।—আমার জীবনেরও অনেক কথা আমার সঙ্গে সঙ্গেই চিতায় উঠিবে ;—কিন্তু এখন—এই জীবনের আসন্ন হিসাব নিকাশের সময়,—দুই একটি পুরাতন কথা কি জানি কেন, বলিতে ইচ্ছা করে! তাই এতকাল পরে এই কথাটি বলিতেছি।—

অনেক দিন পূর্ব্বে—সাল বলিতে পারিব না—তবে অনেক দিন পূর্ব্বে —আমি যখন দেশের মায়া, স্বজনগণের মমতা, কাটাইয়া নিরুদ্দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, সেই সময়ের কথা বলিতেছি। আমি তখন পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যে থাকিতাম। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত যখন যেদিকে দুই চোক যাইত, সেই দিকেই চলিয়া যাইতাম ; বাধা দিবার কেহ ছিল না, ব্যবস্থা বন্দোবস্তের প্রয়োজন ছিল না ; কি খাইব সে ভাবনাও ছিল না। যিনি কোটী কোটী জীবজন্তুর আহার দিতেছেন, তিনিই আমাকে আহার দিয়া বাঁচাইবেন ; আর তিনি যদি আহার না দেন, তাহা হইলে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীও আমাকে খাওয়াইতে পারিবেন না ;—এই বিশ্বাস অন্ততঃ তখন আমার পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তাই, অমন করিয়া বেড়াইতে পারিতাম, কোন ভবিষ্যতের ভাবনাই মনে উঠিত না ; সে ভাবনার ভাব না পাইয়া আমি সমস্ত ভাবনা ভূতভাবনের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

এই রকম যখন অবস্থা, এমনই যখন মনের ভাব, সেই সময়ে চৈত্র-মাসের শেষে একদিন, হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় স্নান করিবার জন্য, দেরাদুনের আবাসগৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমি যতদিন হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, ততদিন যখনই যেখানে থাকি না কেন, চৈত্র মাসের শেষদিনে হরিদ্বারে যাইতাম। যাঁহারা আমার পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু, তাঁহারা বলিতেন আমি মুখে যাহাই বলি না কেন, অন্তরে আমি ঘোর হিন্দু ;—তাই আমি চৈত্র-সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিতে যাই। আবার যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহারা বলিতেন আমি হরিদ্বারে লোকারণ্য দেখিতে যাই। আমার একটি থিয়সফিগ্রস্ত বন্ধু ছিলেন ; তিনি বলিতেন, আমি মহাত্মাদিগের দর্শন করিতে যাই। আমি তখন কাহারও কথায় সায়ও দিতাম না, প্রতিবাদও করিতাম না ; এখনও সে কথা বলিবার প্রয়োজন দেখি না। যে জন্যই হউক, আমি প্রতিবৎসর

চৈত্রমাসের শেষে হরিদ্বারে যাইতাম, এবং গঙ্গাস্নানও করিতাম ; দুই তিন দিন ঘুরিরা ফিরিয়া, যেদিকে হয় চলিয়া যাইতাম ! যেবার সেই খুব বড় কুম্ভমেলা হয়, সেবারও আমি হরিদ্বারে গিয়াছিলাম।

পূর্ব্ব হইতেই শুনিয়াছিলাম যে, হরিদ্বারে সেবার এত যাত্রীর সমাগম হইবে যে, কিছুতেই লোকের স্থান হইবে না ; এমন কি বাহিরে, গাছের তলায় বা অনাবৃত স্থানেও, লোকে বসিবার স্থান পাইবে না। আমার তাহাতে কোন ভয়েরই কারণ ছিল না ; আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আরও সহিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলাম। তাই, বন্ধুগণ যখন সেবার বলিলেন, "ভায়া, এবার যদি হরিদ্বারে যেতে হয়, তা হ'লে আগে থেকে একটা আড্ডা ঠিক কর।"—আমি সে কথায় কর্ণপাত করি নাই, কর্ণপাত করিবার প্রয়োজনও অনুভব করি নাই। তাহার পর, যথাসময়ে হরিদ্বারে চলিলাম। পথে যাত্রীর সংখ্যা দেখিয়া বুঝিলাম যে, লোকারণ্যই হইবে। মনে বড়ই আনন্দ হইল।

আমি দেরাদুন হইতে হরিদ্বারে যাইতেছিলাম। তখন দেরাদুনের রেল হয় নাই। রেলে যাইতে হইলে দেরাদুন হইতে ৪২ মাইল এক্কা বা ডাকগাড়ীতে সাহারণপুরে গিয়া সেখান হইতে রেলে চড়িয়া লুক্সার জংসনে গাড়ী বদল করিয়া হরিদ্বারে যাইতে হইত। এত ঘোরা পথে কেহই যাইত না ; সকলেই হরিদ্বারে যাইতে হইলে অরণ্যপথে কেহ বা এক্কায়, কেহ বা গো-যানে,—আমার মত লোকে পদব্রজে,—যাইত। এবারও আমি পদব্রজেই গিয়াছিলাম।

হরিদ্বার হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, রাস্তার পার্শ্বে, একটি দেবালয় আছে। দেবালয়টি কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু তাহা অতি সুন্দর। চারিদিকে বাগান, বাগানের মধ্যে মন্দির ; মন্দিরটিও ছোট নহে, আশে পাশে আরও পাঁচ সাতখানি ঘর আছে।

আমি যখন সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইবার অধিক বিলম্ব নাই। দেখিলাম, রাস্তার পার্শ্বে যেখানে একটু স্থান আছে, সেখানেই যাত্রীরা আড্ডা করিয়াছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, হরিদ্বার একেবারে লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; এখন যাহারা আসিতেছে, তাহারা রাস্তার মধ্যে, যেখানে স্থান পাইতেছে সেইখানেই, অবস্থিতি করিতেছে। আমি তখন মনে করিলাম, রাত্রিটা এই দেবালয়েই কাটাইয়া দেওয়া যাউক; পরদিন হরিদ্বারে গিয়া স্নানান্তর যদি কোথাও থাকিবার ব্যবস্থা ভগবান না করিয়া দেন, তাহা হইলে দেরাদুনেই ফিরিয়া যাইব। এই মনে করিয়া আমি দেবালয়-চত্বরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেখানেও অনেক হিন্দুস্থানী সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যে কয়খানি ঘর ছিল, তাহা যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; অনেকে বাগানের মধ্যে, অনাবৃত আকাশতলে আশ্রয়-লাভ করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে দেবালয়ের মধ্যে, মন্দিরের নিকট, উপস্থিত হইলে এক সন্ন্যাসীবেশধারী ব্যক্তি আমার দিকে অগ্রসর হইয়া হিন্দী-ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এখানে থাকিতে চান?" আমি বলিলাম, "ইচ্ছা ত তাই ছিল, কিন্তু এখানে যে একেবারেই স্থানাভাব দেখিতেছি!" সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, স্থানাভাব ত বটেই; তবে আপনার জন্য একটু স্থান করিয়া দিতে পারিব। সঙ্গে কি লোক জন আছে?" আমি বলিলাম, "এক লোকনাথ ব্যতীত আর কেহ ত সঙ্গী নাই; আর সঙ্গী মিলে নাই বাবা!" আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি বলিলেন, "মন্দিরের বারান্দায় আপনি আমারই সঙ্গী হই-বেন।" আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনিই কি এই দেবালয়ের সেবাইত।" তিনি বলিলেন, "সেবা ত জানি না, সেবা যে করিতে পারি তাহাও মনে হয় না; তবে আমার উপরেই সে ভার আছে।" এই বলিয়া

তিনি মন্দিরের বারান্দায় উঠিলেন ; আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার সঙ্গে কোন আসন আছে কি ?" আমি বলিলাম, "ভগবান এত আসন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন !— আমি আসন বহিয়া মরিব কেন ? এই কাপড়খানি, আর গামছাখানি ব্যতীত আমার সঙ্গে একটী লোটা পর্য্যন্তও নাই।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "বহুত খুব !" এই বলিয়া বারান্দার পার্শ্ব হইতে একখানি ছোট কম্বল আনিয়া আমাকে আসন করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম "এই ধরাসনই আমার রাজাসন, আমার অন্য আসনের প্রয়োজন নাই।" তখন সন্ন্যাসী রাত্রির আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম "সেজন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না, আমার আহার যাহা হয় হইবে।" তখন আরতির সময় হইল দেখিয়া, সন্ন্যাসী নিকটবর্ত্তী ইন্দারার দিকে চলিয়া গেলেন, এবং একটু পরেই আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই অন্য লোকে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল, এবং আরতির আয়োজন করিতেছিল। মন্দিরমধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ; আর কোন মূর্ত্তি নাই। আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, যাত্রীরা যে যেখানে ছিল, সকলেই মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। আরতি আরম্ভ হইল ; যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল, কেহ বা ভজন গায়িতে লাগিল। একটু পরেই আরতি শেষ হইল। যাত্রীদের অনেকেই, দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া, স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল ; দুই চারিজন বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় মন্দিরের বারান্দায় উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসীও আসিয়া সেখানেই বসিলেন। তখন ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইল ; আগন্তুকগণের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; সন্ন্যাসীও তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলাম, তিনি খুব পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ; সাধারণ পুরোহিতের মত নহেন। আমি

এই ধর্ম্মালোচনার মধ্যে কোন কথাই বলিতেছি না দেখিয়া, সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, "লেড়্কা! তুমি যে কোন কথাই বলিতেছ না! ক্ষুধা পাইয়াছে কি?' আমি বলিলাম, "বলিবার কথা ত বেশী নাই বাবা, শুনিবার কথাই বহুত। আপনাদের কথাই শুনিতেছি; আমি আর কি বলিব?" আমার কথা শুনিয়া, সেখানে উপবিষ্ট একটি বৃদ্ধ আমার দিকে ফিরিয়া বসিলেন, এবং আমার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।—আমার আবার পরিচয় কি? আমি অতি সংক্ষেপে আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনী বলিলাম। বৃদ্ধ, আমার কথা শুনিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; তাহার পর, ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা, তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। এই অন্ধকারে তোমার মুখখানি দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু তোমার স্বর শুনিয়া আর এক হতভাগ্যের কথা আমার মনে হইতেছে!" এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য যদিও আমার কৌতূহল হইল, কিন্তু আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না; চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একটু পরেই বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা রাত্রিতে তোমার কি আহার হইবে?" আমি বলিলাম, "কিছু না।" বৃদ্ধ বলিলেন, "সে কি কথা? তুমি অনাহারে থাকিবে? ওবেলায় কি খাইয়াছ?" আমি বলিলাম "চারিটি ভুজা।" বৃদ্ধ বলিলেন "কি, তুমি আজ তামাম দিন ভুজা খাইয়া আছ? রুটী বানাও নাই?" আমি বলিলাম "বিশেষ প্রয়োজন মনে করি নাই!" আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আহারটাকে কি কোন প্রয়োজনের মধ্যেই ধর না?" আমি বলিলাম, "ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজন আছে বই কি; কিন্তু যাহা হয় কিছু হইলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। রুটীই যে খাইতে হইবে,—এমন কোন কথা

নাই।” সন্ন্যাসী হা—হা— করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; তিনি বলিলেন, “তা হবে না। আমরা সকলেই খাইব, আর তুমি ভুখা থাকিবে ;—তা কি হয়! আমার সঙ্গে মহারাজ (রসুয়ে ব্রাহ্মণ) আছে, তোমার আহার আমাদের সঙ্গেই হইবে ; আমি বলিয়া আসিতেছি।” এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ বাগানের এক পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, “তোমার লোকনাথ:আহার মিলাইয়া দিলেন!” তাহার পর নানা কথা হইতে লাগিল ; বৃদ্ধও ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কথায় যোগদান করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে একটি লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, আহার প্রস্তুত হইয়াছে। বৃদ্ধ আমাকে সঙ্গে লইয়া বাগানের এক পার্শ্বে-উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম সেই স্থানে দুইটি বস্ত্রাবাস রহিয়াছে ; একটী ছোট, অপরটি অপেক্ষাকৃত বড়। আমরা সেই বড় বস্ত্রাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই বস্ত্রাবাসের মধ্যে একটী ‘হারিকেন্’ লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে দেখিলাম, এক পার্শ্বে একটি বিছানার উপর দুইটি মহিলা বসিয়া আছেন ; একজন বর্ষীয়সী, অপরজন যুবতী। সম্মুখেই মৃত্তিকাসনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে ; বুঝিতে পারিলাম সেটি দাসী বৃদ্ধ বস্ত্রাবাসের অপর পার্শ্বস্থ একটি বিছানায় আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি সেই বিছানায় উপবিষ্ট হইলে বৃদ্ধও আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। একটি ভৃত্য তামাক লইয়া আসিল। বৃদ্ধ আমাকে তামাক খাইতে বলিলেন। আমি বলিলাল “আমি তামাক খাই না’। ভৃত্য তখন একটা আলবেলায় কলিকাটা চড়াইয়া দিল ; বৃদ্ধ তামাক সেবন করিতে লাগিলেন এবং ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার এ দৃষ্টির কোন অর্থই বুঝিতে পারিলাম না! একটু পরেই বৃদ্ধ উঠিয়া গেলেন এবং পূর্ব্ব-কথিত বর্ষীয়সীর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে চুপে চুপে কি বলিলেন।

বৃদ্ধ তখনই আবার আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, বলিলেন, "বাবুজি! যাহার সঙ্গে আমি এইমাত্র কথা বলিলাম, উনি আমার পরিবার, আর যিনি উহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন তিনি আমার পুত্রবধূ। আমি উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে আসিয়াছি। এবার আমার আসিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমার পুত্রবধূ নিতান্ত জিদ্ করায় আমাকে বাধ্য হইয়া আসিতে হইল। এখন কা'ল উহাদের স্নান করাইয়া আনিতে পারিলেই বাঁচি। যে রকম লোক-সমারোহ হইয়াছে, তাহাতে কাল যে কি হইবে, বলিতে পারি না! একবার ত—অনেক দিন আগে—বহুত খুন জখম দাঙ্গা ফরিয়াদ্ হইয়া গিয়াছিল; এবার তা না হয়।" আমি বলিলাম, "এবার গবর্ণমেণ্ট খুব ভাল ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বড় ভীড় হইবে মনে করিয়া, বাড়ী হইতে দুইজন বরকন্দাজ ও দুইজন চাকর সঙ্গে আনিয়াছি।" আমি তখন বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! আমার পরিচয় ত আপনি পাইয়াছেন; কিন্তু আমি এখন যাঁর অতিথি, তাঁর পরিচয় ত পাইলাম না!" তিনি বলিলেন, "আমার পরিচয় কি? আমি সামান্য একজন জমিদার; * * তহসিলে আমার বাড়ী। আমার আয় অতি সামান্য, এই পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে। সংসারে আমার আর কেহ নাই;—আছেন স্থধু ওঁরাই দুইটী মহিলা!" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমি ইহা হইতে স্থির করিলাম,—বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র ছিল; সেই পুত্রটী মারা-গিয়াছে; এখন সংসারে তাঁহার স্ত্রী ও বিধবা পুত্রবধূ আছেন, আর কেহই নাই। আমি তখন বলিলাম, "আপনার পুত্রটী কতদিন মারা গিয়াছে?" আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধের মুখ মলিন হইয়া গেল; তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নেহি—নেহি, বাবু সাব্—লেড়্কা মর্ নেহি গিয়া; ফেরার্ হো

গিয়া।"—আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম ; বলিলাম, "আমাকে ক্ষমা করিবেন ; আমি আপনার কথা না বুঝিয়া অন্যায় কথা বলিয়া ফেলিয়াছি।" তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন ; এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, দ্বিতীয়-বস্ত্রাবাসে আহারের স্থান হইয়াছে। বৃদ্ধ তখন আমাকে লইয়া আহারের স্থানে গেলেন। লোকনাথ আমার জন্য সে রাত্রিতে সেই পাহাড়ের মধ্যে রাজভোগই মাপাইয়া রাখিয়াছিলেন! আহার করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিলেন "বাবুজি! আমার যে ছেলেটী ফেরার্ হইয়াছে, তাহার চেহারার সহিত তোমার চেহারার অনেকটা মিল আছে। আমি সেই কথাই আমার পরিবারকে বলিতেছিলাম ; তিনিও তাহাই বলিলেন!" ভাল কথা!—আমি কোথাকার বাঙ্গালী, আর তিনি লুধিয়ানা জেলার একজন জমিদার ; আমি পথের ভিখারী, তিনি একজন রইস্!—আমার চেহারা, তাঁহার পলাতক পুত্রের চেহারার মত! যাক্,—এই পাহাড়ের মধ্যে যদি পিতামাতার স্নেহ পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি!

আহার শেষ হইলে আমি বলিলাম, "আমি তাহা হইলে মন্দিরে যাই।" বৃদ্ধ আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তা হইবে না ; তোমার সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই নাই! তুমি আমাদের তাম্বুতেই শয়ন করিবে, চল।"—একই তাম্বুর মধ্যে একপার্শ্বে স্ত্রীলোকেরা থাকিবেন ; আর তাহারই মধ্যে সম্পূর্ণ-অপরিচিত আমি, কেমন করিয়া রাত্রি কাটাই! এই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া তাঁহাকে বলিলাম। তিনি আমার কোন আপত্তিই মঞ্জুর করিলেন না ; কাজেই আমাকে সেই বস্ত্রাবাসেই রাত্রি কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। আমার জন্য তখনই পৃথক্ একটা শয্যা রচনা হইল ; কিন্তু তখনই নিদ্রাদেবীর শরণ গ্রহণ করা হইয়া উঠিল না! বৃদ্ধ তখন নিজের দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মত হতভাগ্য আর

এ দুনিয়ায় দু'টী নাই। আমার জমি জেওরাৎ যাহা আছে, তাহাতে সংসার বেশ চলিয়া যায়, দুপয়সা স্থিতিও হয় ;—কিন্তু এ বিষয় কে খাইবে? সংসারে আমার একটি মাত্র পুত্র, সেও আজ চারি বৎসর ফেরার্!—কোথায় যে গেল—বাঁচিয়া আছে—কি মরিয়াছে, কিছুই জানি না!" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমি বলিলাম, "সে সকল কথা বলিতে যদি মনে কষ্ট হয়, তাহা হইলে আর সে খবর আমাকে দিয়া কাজ নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন, "না,—না ; কষ্ট হয় বলিয়া কি করিব? যদিও তোমার সঙ্গে অল্পক্ষণের পরিচয়, তবুও তোমার উপর আমার বড়ই স্নেহ জন্মিয়াছে। বলিয়াছি ত, তোমার চেহারা অনেকটা আমার ছেলের মত ; তোমাকে দেখিয়া, তাহার কথা আমার মনে হইতেছে!—তুমি আমার দুঃখের কথা শোন ;—গ্রামের মধ্যে আমারই অবস্থা ভাল, তাহার উপর লছমনপ্রসাদ আমার একমাত্র সন্তান ; সুতরাং তাহাকে ছেলেবেলা হইতে সকলেই বেশী আদর করিত। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করি নাই ; কিন্তু—বড়-মানুষের ছেলেদের যেমন হয়--সে পড়াশুনায় মন দিত না ; সারাদিন খেলা করিয়া, আমোদ করিয়া কাটাইত! পনর বৎসর বয়সের সময়ই সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল। আমি কি করিব? একমাত্র পুত্র, তাড়না করিতে পারি না। তখন তাহাকে বিষয়কর্ম্ম দেখিতে বলিলাম। সে তাহাতেও মন দিল না ; তাহার কতক-গুলি কুসঙ্গী জুটিল। দশজন আত্মীয় পরামর্শ দিলেন যে, বিবাহ দিলে ছেলেটা ভাল হইবে। সেই ভাল বিবেচনা করিয়া, অনেক অনুসন্ধানে বড়-মানুষের ঘরের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিলাম। কিন্তু কিছুই হইল না ; লছমনপ্রসাদ ক্রমেই খারাপ হইয়া যাইতে লাগিল। সে মদ খাওয়া আরম্ভ করিল, অন্যান্য কুক্রিয়াতেও আসক্ত হইল। একমাত্র ছেলে ; তাহার অসদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়াও শুনিতাম না,—নানা জনের নানা কথায়

কর্ণপাত করিতাম না। ক্রমেই সে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। তাহার অত্যাচারে গরিব-লোকের স্ত্রী কন্যা লইয়া গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আঠার বৎসর বয়সের ছেলে যে এমন বদ্ হইয়া যাইতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না! শেষে একদিন শুনিলাম, আমার প্রতিবেশী এক গৃহস্থের বিধবা-কন্যাকে সে পাপপথে লইয়া গিয়াছে! এতদিনও আমি সহিয়াছিলাম; কিন্তু এ সংবাদ শুনিয়া আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অনেক ভৎর্সনা করিলাম, দুর্ব্বাক্যও বলিলাম। সেই রাত্রিতেই সে ঐ বিধবা-মেয়েটিকে কুলের বাহির করিয়া কোথায় চলিয়া গেল;—আমি লজ্জায়, ঘৃণায় গ্রামে মুখ দেখাইতে পারিলাম না; তাহার কোন অনুসন্ধানও করিলাম না! কিছুদিন পরে, আর একটি হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইলাম; সে কথা মনে করিতেও ঘৃণা হয়;—আমার ছেলে না কি চুরীর অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে! যে মেয়েটিকে সে কুলের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিছুদিন পরে তাহাকে পরিত্যাগ করে;—মেয়েটি বাজারে আশ্রয় লইয়াছে। হতভাগা যদি তখনও বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহা হইলেও হয়;—সে তাহা করিল না, কুসঙ্গে পড়িয়া, অর্থাভাবে চুরী আরম্ভ করিয়া দিল। পুলিস তাহাকে যখন গ্রেপ্তার করে, তখন আমি সংবাদ পাই; কিন্তু আমার তখন এমন রাগ হইয়াছিল যে, আমি তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিলাম না। আমি ভদ্রলোক; দেশে আমার মানসম্ভ্রম আছে; জেলার উপর দশজন আমাকে জানে, চেনে;—আমার ছেলে কি না চুরী করিল! আমি তাহার জন্য কিছুই করিলাম না। আমার পরিবার অনেক কাঁদাকাটি করিলেন; কিন্তু আমি সে হতভাগাকে কোন প্রকার সাহায্য করিলাম না। সে যে কার্য্য করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত দণ্ড সে ভোগ করুক। তাহার পরেই শুনিলাম, তাহার তিনমাসের জেল হইয়াছে!

এ সংবাদ শুনিয়া মন বড়ই কাতর হইল।—হাজারও হউক সন্তান ত বটে! তখন অনুশোচনা উপস্থিত হইল; মনে হইল, চেষ্টা করিলে হয় ত তাহাকে বাঁচাইতে পারিতাম।—কিন্তু তাহা আর হইল কৈ! তাহার পর ভাবিলাম, এই শাস্তির পর, তাহার স্বভাব হয় ত ভাল হইবে; সে বাড়ীতে আসিয়া ঘরসংসার করিবে। তিনমাস পরে, যে দিন তাহার কারা-মুক্তি হইবার কথা, সেইদিন আমার এক গোমস্তাকে পাঠাইয়া দিলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, জেলের মধ্যে বেশ ভাল ভাবে থাকায় সরকার বাহাদুর তাহাকে তিনদিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমার গোমস্তা সেখানে তাহার অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোন খোঁজই পাইল না! আমার পরিবার বলিলেন যে, মনের দুঃখে এবং লজ্জায় সে দেশত্যাগী হই-য়াছে;—আর সে বাড়ীতে আসিবে না! কেনই বা তাহার বিবাহ দিয়া-ছিলাম।—এখন বধূমাতার মুখ দেখিলে, আমার বুক ফাটিয়া যায়! তাঁহার বাপ ভাই, কতবার তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল; কিন্তু বধূ-মাতা যাইতে চাহেন নাই! জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন, 'তিনি যদি হঠাৎ আসেন, আর বাড়ীতে আমাকে না দেখেন, তাহা হইলে কি মনে করি-বেন!' এমন মেয়ে হয় না। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এমন মেয়ের অদৃ-ষ্টেও ভগবান এত কষ্ট লিখিয়াছিলেন;—ছেলেটা বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়া গিয়াছে, তাই বা কে বলিবে? বৌ-মা আমার কোন দিন কিছু বলেন না; নীরবে চক্ষের জল ফেলেন; শরীরের উপর যত্ন নাই; কোন সাধ-আহ্লাদ নাই। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়; কিন্তু তাঁহার এ বেদনা দূর করিবার ত কোন উপায় দেখি না। তাঁহাকে কত ব্রত-নিয়ম করিতে বলি;—তিনি একই কথা বলেন, 'তিনি আসুন,—তখন সব করিব।'"

"এমনই করিয়া চারি বৎসর গেল; তাহার ত কোন খোঁজই পাইলাম না।

এবার এখানে কুম্ভমেলা।—আমি কখনও কোন তীর্থে যাই নাই ; আমার পরিবারও কখন তীর্থে যাইবার কথা আমাকে বলেন নাই।—সেদিন বধূ-মাতা আমার পরিবারকে বলিলেন যে, 'এবার গঙ্গাস্নানে গেল ভাল হয়।' আমার পরিবার তাহাতে বলেন যে,—'এবার হরিদ্বারে যাওয়া বড়ই কষ্ট-কর হইবে ;—এবার সেখানে অনেক লোক হইবে, থাকিবার স্থান মিলিবে না।' বধূমাতা তাহাতে বলেন, 'এবার সেখানে চলুন ; আমার মনের মধ্যে কে যেন বলিতেছে,—সেখানে গেলে তাঁহার দর্শন মিলিবে! আজ কয়দিন হইতেই আমার মনের মধ্যে ঐ কথা জাগিতেছে ; কে যেন যখন তখনই বলে, মেলায় যা, সেখানে তোর স্বামী মিলিবে।' আমার পরি বারের নিকট যখন এই কথা শুনিলাম, তখন আমি সকলকে লইয়া এখানে আসিবার সঙ্কল্প করিলাম। বধূমাতা কখনও কোন কথা বলেন না ; আজ চারিবৎসর কোন কিছুই বলেন নাই। এবার যখন তাঁহার এখানে আসিবার ইচ্ছা হইয়াছে,—আর তাঁহার মনে যখন কথাটা উঠি-য়াছে যে, এখানে এলে লছমনপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে,—তখন যত টাকা লাগে, যত অসুবিধাই হউক,—আমাকে আসিতেই হইবে।—তাই তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিয়া, এখানে আসিয়াছি। এই মন্দিরের সেবাইৎ সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে আমার গরিবখানায় পদধূলি দিয়া থাকেন ; তাই এখানে তাঁহারই আশ্রয়ে আসিয়াছি।—বধূমাতার কথা সম্পূর্ণ না ফলুক, কিছু ফলিয়াছে ;—আমরা তোমাকে ত পাইয়াছি। তুমিই এখন আমা-দের ছেলের মত ; তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। সংসারে ত তোমার কেহই নাই। যে কয়দিন আমি বাঁচিয়া থাকি, তুমি আমার কাছে থাকিও ; তার পর যার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হইবে!"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল, আমি বলিলাম, "আপনি নিরাশ হইতেছেন কেন? তিনি অবশ্যই ফিরিয়া আসিবেন। সতী-রমণীর

কথা বৃথা হয় না। এত কাল ত আপনার পুত্রবধূ কোন প্রকার খোঁজ খবরের জন্য অনুরোধ করেন নাই। এবার তিনি অনুরোধ করিলেন কেন? এতকাল পরে তিনি এখানে আসিতে চাহিলেন কেন? তাঁহার মনের মধ্যে কে ডাকিয়া বলিয়াছে, এখানে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আমার বিশ্বাস, এবারই তাঁর সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎ হবে!" বৃদ্ধ বলিলেন, "এমন অদৃষ্ট কি হবে? বিশেষ সে, যতই অপরাধ করুক, তাকে আমার ক্ষমা করা উচিত ছিল;—অন্ততঃ বৌমার দিকে চাহিয়াও তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা উচিত চিল। কি জান বাবা, এক এক সময়ে উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকে না। আমার তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল; তাহার ফলও ভোগ করিতেছি!—আরও কতকাল ভুগিতে হইবে, ভগবানই জানেন!—যাক্, রাত্রি অনেক হয়েছে; কা'ল আবার খুব ভোরে উঠ্‌তে হবে।—তুমি বাবা, আমাদের সঙ্গ ছেড়ো না।"

তাহার পর আমরা শয়ন করিলাম; বিছানায় শুইয়াও অনেকক্ষণ নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। পূর্ব্বদিক্ আলো হইবার পূর্ব্বেই, যাত্রীরা মহাকলরব করিয়া, হরিদ্বারে স্নান করিবার জন্য বাহির হইল; আমরাও তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম।—বৃদ্ধের পটমণ্ডপ রক্ষার জন্য একজন চৌকীদার থাকিল।

তাহার পর গঙ্গাস্নান! সে এক অভিনব দৃশ্য! তাহার বর্ণনা আর দিব না, সে কথা বলিবার জন্যও এ প্রস্তাব নহে। সরকার বাহাদুর যে প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও স্নানের অসুবিধা হয় নাই। আমরা সকলে স্নান শেষ করিয়া উপরে উঠিলাম। বৃদ্ধ সেই বাগানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি বলিলাম, "আপনারা যান, আমি একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসি।" বৃদ্ধ বলিলেন, "এখন বাসায় চল, আহারাদির পর বেড়াইতে আসিও।" আমি বলিলাম, "না,—আপ-

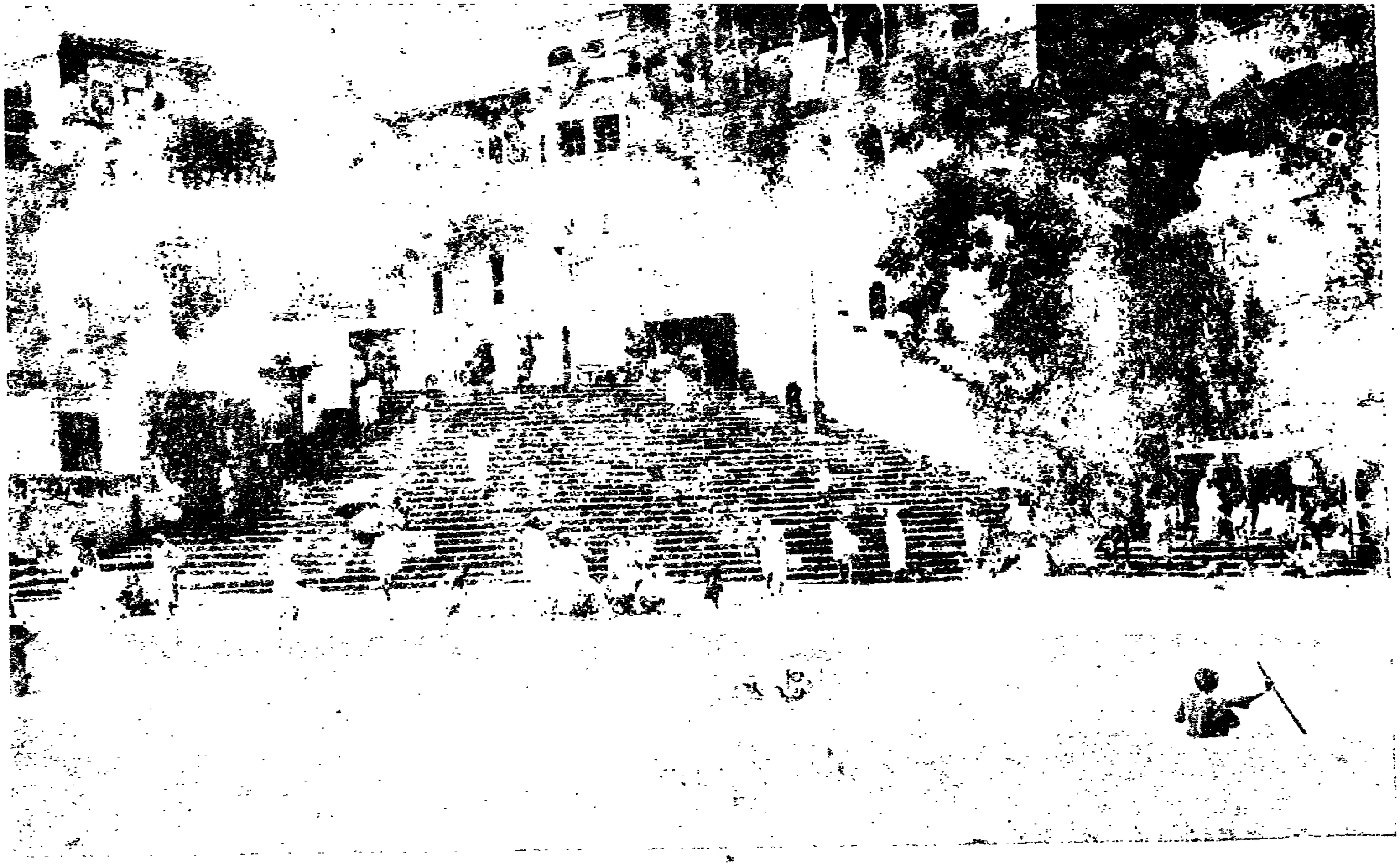

নারা যান। আমি সারাদিন এই লোকারণ্যের মধ্যে বেড়াইয়া, সন্ধ্যার সময় আপনার ওখানে যাইব।" আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "বিলম্ব করিও না, সন্ধ্যার মধ্যেই যাইও। কালই আমরা চলিয়া যাইব, —মনে থাকে যেন।" আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলাম।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন; আমি তখন সেই জনসমুদ্রে ডুবিয়া গেলাম আমাকে যেন সে দিন ভূতে পাইয়া বসিল। সাধুসন্ন্যাসীদিগের সহিত দেখাশুনা করিব,—এ দিক ওদিক বেড়াইব;—কিন্তু আমার তাহা হইল না। আমার মনের মধ্যে কেমন করিয়া এই কথাটা প্রবেশলাভ করিল যে, লছমনপ্রসাদকে আজ এই লোকারণ্যের মধ্য হইতে খুজিয়া বাহির করিতে হইবে। স্নান করিতে আসিবায় সময় লছমনপ্রসাদের স্ত্রীর সেই মৌন, কাতর প্রার্থনা,—সেই মলিন মুখ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি পথে চলিবার সময় অনেকবার তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিলাম; একবার তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরও পড়িয়াছিল;—সেই দৃষ্টির মধ্যে কি ব্যাকুলতা, কি প্রাণের বেদনা! আমি যেন তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, লছমনপ্রসাদকে—তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্বকে, তাঁহার হারাণো রত্নকে—খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার, তিনি সেই এক কাতর দৃষ্টিতেই আমার উপর সমর্পণ করিলেন! আমি সেই সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ সারাদিন, এই হরিদ্বারে জনসমুদ্র মন্থন করিয়া যুবতীর সেই রত্নের অনুসন্ধান করিব —এবার এই মেলায় ইহাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য হইল। আমারই মত তাহার চেহারা; সুতরাং যদি তাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে চিনিতে পারিব। বৃদ্ধ যখন সকলকে লইয়া চলিয়া যান, তখন যুবতী আমার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন;—সে কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টি,—সে আকুল প্রার্থনা আমার হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল।

আমি সেদিন যেন যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলাম। সেই বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—আমি একটুও বসি নাই, কিছুই আহার করি নাই, জলবিন্দু পর্য্যন্তও গ্রহণ করি নাই, এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেও পারি নাই! হরিদ্বার, মায়াপুর, কনখল, গঙ্গার অপর পারের পাহাড়ের উপর চণ্ডীর মন্দির, গ্রাম মাঠ—আমি সে সমস্ত স্থানে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আর সকলের মুখের দিকে চাহিয়াছি! হায় অদৃষ্ট! সারাদিন খুঁজিয়াও সেই মুখখানি দেখিতে পাইলাম না,—কেহই আমাকে জিজ্ঞাসাও করিল না যে, আমি এই লোকারণ্যের মধ্যে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে আমি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; কাহারও সহিত কথা পর্য্যন্ত বলি নাই।

সন্ধ্যার সময় আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, ক্ষুধা তৃষ্ণায় তখন আমাকে কাতর করিল; যে পা দুইখানি হিমালয়ের কত চড়াই-উৎরাই আমাকে অনায়াসে পার করিয়া দিয়াছে, তাহারা আজ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আমি তখন মায়াপুরের নিকট একটা বাগানের মধ্যে এক বৃক্ষতলে একেবারে শুইয়া পড়িলাম। সেই বৃক্ষতলে অনেকগুলি সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া ছিলেন; আমি একবার তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলাম,—কিন্তু লছমনপ্রসাদের মত কাহাকেও সেখানে দেখিলাম না। বৃদ্ধের বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া যাইবার তখন শক্তিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। ফিরিয়া গেলে লছমনপ্রসাদের স্ত্রী যখন সতৃষ্ণনয়নে আমার দিকে চাহিবেন, তখন, তাঁহার প্রাণে আশার সঞ্চার করিবার জন্য, আমি কি বলিব? আমাকে ত বলিতে হইবে যে, তাঁহার স্বামীকে খুঁজিয়া পাইলাম না! তখন সেই দেবীরূপিণী সতী যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবেন, তাহা আমার সহ্য হইবে না। কোথাকার কে আমি,—কেমন করিয়া এক রাত্রিতে সহসা সেই হিন্দুস্থানী পরিবারের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া পড়িলাম!—এই

তোমার পথ চাহিয়া আছেন। চল ভাই,—আমার সঙ্গে চল।” লছমন-প্রসাদ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তবে চলুন।”—সে আর কোন কথা বলিল না। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সে মহাপুরুষের আর সাক্ষাৎ পাইলাম না! শুভ পয়লা বৈশাখে সেই একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। আমার পুণ্যবলে দেখি নাই,—আমার সুকৃতির বলে আমি সেই দেববাণী শুনি নাই; যে সতী রমণীর কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়া আমি হরিদ্বারের সেই জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তাঁহারই সতী-মহিমায়—তাঁহারই কৃপায়—আমি সেই পয়লা বৈশাখের অরুণোদয়কালে মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম। এ সকল তাঁহারই লীলা, তাঁহারই খেলা!—আমি তখন সেই বৃক্ষমূলে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম; ঠিক সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষতল হইতে একজন সন্ন্যাসী গায়িয়া উঠিল,—

“সেবা, বন্দন্, আউর অধীনতা, সহজে মিলয়ে গোঁসাই।”

তাহার পর?—তাহার পর আর কি!—তাহার পর সোজা কথা;—লছমনপ্রসাদকে তাহার বৃদ্ধ পিতামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম। বাগানের মধ্যে আমরা যখন প্রবেশ করিলাম, তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। আমি লছমনপ্রসাদের হাত ধরিয়া, একেবারে বৃদ্ধের পটমণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হইলাম; উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, **“মায়ী! এই লেও তেরা লছমনপ্রসাদ।”**

আমার কথা শুনিয়াই বৃদ্ধ ও তাঁহার স্ত্রী দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন;—মাতা ত একেবারে পুত্রকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন; বস্ত্রাবাসের দ্বারের পার্শ্বে সেই দেবীমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি সেই দিকে চাহিলাম। তাঁহার দৃষ্টিতে তখন যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা এ জীবনে আর কখনও দেখি নাই,—আর কখনও বুঝি দেখিব

না ! তাহা অবর্ণনীয়,—তাহা স্বর্গীয় ! মানুষের নয়নে এমন শান্ত পবিত্র কোমল জ্যোতিঃ কখনও দেখি নাই !—শুভ পয়লা বৈশাখে আমার সেই আর একটি লাভ ! এখন ভাবিয়া পাই না, সেই মহাপুরুষের দর্শনলাভই অধিক মূল্যবান—অথবা, এই সতী-রমণীর হাস্যোৎফুল্ল পবিত্র বদন ও জ্যোতির্ম্ময় নেত্রদ্বয়নিঃসৃত আশীর্ব্বাদ লাভই অধিক মূল্যবান ?—এ কথার মীমাংসা কে করিয়া দিবে ?

রঘু পাগলা।

দেখ, হয় আমাকে যেমন সর্ব্বদা ডাকিয়া থাক, তেমনই 'রঘো' বা 'রঘু পাগলা' বলিয়া ডাকিও, আর না হয় 'বোকা' 'হতভাগা' যাহা বলিতে হয়, তাহা বলিয়া ডাকিও ;—কিন্তু খবরদার ! অমন করিয়া দন্তপাটী বিস্তৃতি-পূর্ব্বক 'রঘুনাথ' বলিয়া আমাকে কেহ ডাকিও না, আমি অমন পোষাকী নাম শুনিতে চাহি না। তোমরা যখনই বল 'রঘুনাথ', অমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাণের কাছে বাজিয়া উঠে 'দেবশর্ম্মণঃ.ভট্টাচার্য্য' 'স্বর্গীয় রামতনু বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পুত্র।' কেন বাপু, আমার মনের মধ্যে সে সকল কথা জাগাইয়া দিয়া তোমাদের লাভ ?

আমি 'রঘো পাগলা'—বেশ ! তোমরা দশ জনে যদি আমাকে পাগলা বলিয়াই খুসী হও,—বেশ, আমি তাহাতে ত মোটেই রাগ করি না। আমাকে যে পাগল বলে, তাহাকে তখনই শুনাইয়া দিই—

এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল,
নদের মাঝে দেখ্ সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যা'ব, পাগল হ'ব
দেখ্‌ব রসের নবগোরা।

পাগল বলিলেই হয় না—পাগল হওয়া মুখের কথা নয়। গাঁজা, ভাঙ্গ, সিদ্ধির নেশায় অনেকে পাগল হইতে পারে ; ধন জনের নেশায় অনেকে পাগল হইতে পারে ,—কিন্তু আসল:পাগল হওয়া বড় শক্ত রে—বড় শক্ত ;

সেই—সেকালে একজন পাগল হইয়াছিল; তাই সে সতী-দেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিজগৎ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। আর এক পাগল সেবার—সেই যে সেবার, নবদ্বীপে আসিয়াছিল। জান না? সেই পাগল। সে বলে কি—

মেরেছে মেরেছে কলসীর কাণা,
তাই ব'লে কি প্রেম দেব না।

এই দুই পাগল। আর তোমরা যত সব ছেঁচড়া মানুষ, ইঁদুরের ঢিবি দেখিয়াই হিমালয় পর্ব্বত ভাব—তোমরা বল কি না 'রঘো পাগলা!' তোমাদের কথা শুনিলে হাসিও পায়, আবার সে কথাও বলি, কান্নাও পায়। তখন মনে হয়—

আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়,
কোথা গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে প্রাণ কেমন করে,
হিয়ে আমার ফেটে যে যায়।
আমি, সযতনে যে রতনে
রেখেছিলাম পূরে হিয়ায়;
আমায় ঘুমের ঘোরে চুরী ক'রে,
সে রতন কে নিল রে হায়!
আমি, সব হারায়ে যে ধন ল'য়ে
বাস করিতাম এ ঘরতলায়;
যদি গেল সে ধন, বল এখন,
করে কাঙ্গাল আর কি উপায়।

আচ্ছা, কান্না পায় না? এই সকল কথা বলিতে গেলেই লোকে বলে আমি পাগল। দূর ছাই, আমি কি কাহারও সঙ্গে গায়ে পড়িয়া কথা বলিতে

যাই ? এই লোচনপুর গ্রামে যদি কেহ থাকে, আসিয়া বলুক না যে, রঘু তাহার একটি কাণা কড়িও ধারে। ধার করিব কেন ? বাবা ৺ রামতনু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কি যে সে লোক ছিলেন ? এ তল্লাটে তাঁহাকে কে জানিত না, কে চিনিত না ? তিনি যখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন, তখন রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ ঘর ব্রাহ্মণ যজমান (আমরা অশূদ্র-যাজী) আর ত্রিশবিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, আর আমার মত ব্যাকরণ সাহিত্যে পণ্ডিত, দ্বাবিংশ বর্ষবয়স্ক আত্মজ শ্রীরঘুনাথ দেবশর্ম্মণঃ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-তীর্থ। আমি পরের দ্বারেই বা যাইব কেন, পরের কাছে ধারই বা করিব কেন—কি দুঃখে ?

বাবা মারা গেলেন, শ্রাদ্ধ শান্তি হইয়া গেল ; দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ সপরিবারে আসিয়া আমার দায় উদ্ধার করিয়া দিয়া গেলেন—যজমানেরা বিলক্ষণ সাহায্য করিলেন। তাহার পর গ্রামে যত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং এখনও আছেন, তাঁহারা সকলেই অনুরোধ করিলেন যে, আমার এক্ষণে বিবাহ করা কর্ত্তব্য, গৃহে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে স্বর্গীয় বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের যে পদ প্রসার ছিল, তাহা অচিরেই আমি অধিকার করিতে পারিব ; কেন না, আমি ইতোমধ্যেই সাহিত্যতীর্থ উপাধি-ভূষিত হইয়াছি। তাঁহাদিগের এই সকল পরামর্শ সম্বন্ধে একটা বিবেচনার প্রয়োজন হইল। প্রথম কথা এই বুঝিলাম যে, গৃহে স্ত্রীলোক না থাকিলে ঘরদ্বার দেখে কে, "জিনিসটা পত্তরটার" সুব্যবস্থা করে কে, যথাসময়ে অন্ন দেয় কে ? কথাটা খুব ঠিক। তাহার পর বিবাহ করিয়া স্ত্রী গৃহে আনিলে ক্রমে সন্তানাদি হইলে, বৃহৎ পরিবার হইবে ; সুতরাং চতুষ্পাঠী স্থাপনাদি দ্বারা চারিদিকে অধ্যাপক বলিয়া খ্যাতি প্রচারের প্রয়োজন হইবে, যজমানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ত্রিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তরে তখন আর চলিবে কেমন করিয়া ? কাযেই দুই একখানি তালুকও কিনিতে হইবে।

তাহার পর এই জীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত কুটীর কি আর সঙ্গতিপন্ন তালুকদার, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-তীর্থের বাসের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে? তখন সুদৃশ্য দ্বিতল অট্টালিকার প্রয়োজন হইবে। তাহার পর বিষয়ী লোক হইলেই দশটা মামলা মোকর্দ্দমা করিতে হইবে, দশটা মিথ্যা সাক্ষ্য, দশখানা জাল দলিল প্রভৃতি সমস্তই করিতে হইবে। কেমন? ব্যস, মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য সব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল!

তখন আগা গোড়া ঠিক নামাইয়া দেখিলাম, এই যে সব জঞ্জাল স্কন্ধে করিতে যাইতেছি, ভবিষ্যতে এই যে সকল অবস্থা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বর্ত্তমান, এ সকল কিসের জন্য। আমি বিনা আয়াসে, বিনা শাস্ত্রালোচনায়, অতি সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, প্রতিদিন হাত পুড়াইয়া নিজের দুইটী অন্ন প্রস্তুত করিবার ভয়েই এ সকল গ্রহের সৃষ্টি—এই সংসাজা রে, সং-সাজা। খ্যাপা কি সাধে গায়িয়াছেন;—

কারে তুই দেখ রে সং, বল দেখি মন
হাসিস্ এমন হা হা করে।
সংসারে সকলেই সং, ভেবে দেখ মন,
সংসারে সং ছাড়া নেই রে;
কেহ বা সংসার ছেড়ে সং সেজেছে,
সংসারে কেউ সং সাজে রে।
ভূমিষ্ঠ হলি যখন, তখনই সং সাজিলি মন,
ভেবে দেখ রে;
কাটালি ছেলেবেলা, করে খেলা
মেখে ধূলা সব শরীরে।

যৌবনে ঘোর সংসারী, চির বেড়ি
পায়ে পরি বেড়াও ঘুরে ;
আবার তোর এ কি সাজা, পরের বোঝা,
বও রে সদা লয়ে শিরে।

অতএব স্থির করিলাম,—একেবারে পাকা স্থির যে, আমার উদর-পোষণের হেতু যে অন্ন ব্যঞ্জনাদির প্রয়োজন, তাহার সংযোজন ও রন্ধনক্রিয়া আমি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারিব। ঘরদ্বার প্রভৃতি দেখা শুনা, তাহা মা'র মৃত্যুর পর বাবা বাঁচিয়া থাকিতেও যে সোণার মা করিয়া আসিতেছে, এখনও সেই করিবে। মা'র মৃত্যুর পর এই চারি বৎসর যদি বাবা দ্রব্যাদি সংগ্রহ-সংরক্ষণ-কার্য্যে কোন ত্রুটি প্রদর্শন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অবর্ত্তমানে আমি তাহা পারিব না কেন? বরঞ্চ বার্দ্ধক্য বিধায় তিনি যাহা সম্যকরূপে করিতে পারিতেন না, আমি তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

তাহার পর চতুষ্পাঠী স্থাপনের কথা। ভারি এক ছটাক সাহিত্য শিক্ষা করিয়াছি ; তাহাই লইয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসি আর কি? আর তাহাতে লাভ? গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ-সন্তান তিনপাতা মুগ্ধবোধ, রঘুর দুই চারিটা সর্গ পাঠ শেষ করিয়া এক একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইয়া বসিবে, শাস্ত্রের নামে অশাস্ত্রীয় ব্যবহার করিবে, গর্ব্ব অহঙ্কারে ধরাকে সর্ষপবৎ জ্ঞান করিবে; আর যজমানের গৃহে কোন অনুষ্ঠানের সময় প্রকৃত কার্য্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া শুধু স্বার্থসিদ্ধির উপায় অনুসন্ধান করিবে ; তাহার ফলে নিজে ত নিরয়গামী হইবেই—যে অধ্যাপক তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও পাপের ভাগী করিবে। এমন কর্ম্ম আমি করিতে পারিব না। বরঞ্চ বাহিরের উঠানে দুই তিনখানি লম্বা ঘর তুলিয়া তাহাতে

গো-শালা প্রতিষ্ঠা করিব, কিন্তু পাঠশালা—চতুষ্পাঠী আমি বসাইতে পারিব না।

এই সকল যখন স্থির হইল, তখন এক দিন আমার পিতার সেই ৭০ ঘর যজমানকে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে, অতঃপর আমার দ্বারা তাঁহাদের যজনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ, আমার সম্পূর্ণ সময়াভাব, বিশেষতঃ উক্ত কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অনাস্থা। এ অবস্থায় তাঁহারা যেন অন্য পুরোহিতের ব্যবস্থা করেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র গ্রামের অনেক ভদ্রলোক আমাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সকলেই নানা তর্ক-বিতর্ক, প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়; অতএব আমি আমার পাগলামি ত্যাগ করি। আমি তাঁহাদিগকে সবিনয় নিবেদন করিলাম যে, আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা ঠিক; ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, আমি পাপের ভার বৃদ্ধি করিতে পারিব না; আমার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতের কায চলিবে না; তবে যদি কেহ "নথ দন্ত ভাঙ্গা এক পোষা পুরোহিত" চাহেন, তাহা হইলে তিনি দেশে তাহা অসংখ্য পাইবেন,—তাহার অভাব নাই! তখন সকলে একবাক্যে সেই বৈঠকে স্থির করিলেন যে, আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে, আমি মনুষ্য-নামের যোগ্য নহি। তথাস্তু!

যাহাদের মধ্যে আমাদিগের সেই ৩০বিঘা ব্রহ্মোত্তর বন্দোবস্ত করা ছিল, তাহারা মনে করিল, এইবার পাগলের সম্পত্তি-তাহারা নির্ব্বিবাদে ভোগদখল করিতে থাকিবে। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা বুঝিতে পারিল, "রঘো পাগলার" সে দিক্ ঠিক আছে। ঐ ত্রিশ বিঘা ব্রহ্মোত্তরই যে এখন আমার সম্বল; তাহাতে অযত্ন করিলে চলিবে কেন? তখন তাহারা বলিল, আমি "সেয়ানা পাগল", আমি আপন গণ্ডা বেশ বুঝিয়া লইতে জানি।

কিন্তু ক্রমে সকলেই বুঝিল যে, আমি আপন গণ্ডাও বুঝি, পরের গণ্ডাও বুঝাইয়া দিতে জানি। এই আমি—"রঘো পাগলা।"

আমি এখন কি করি, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসি, তাহার পর নিজে যাহা বুঝি, নিজে যাহা ভাবি, সেই হিসাবে ইষ্টদেবতার পূজা অর্চ্চনা শেষ করি; তাহার পর গ্রামের মধ্যে বাহির হই। যাহার যাহা কিছু অভিযোগ, যাহার যাহা কিছু আবদার, সব এই রঘুর কাছে। রঘু সকলের জন্য খাটিয়া যথাসাধ্য করিয়া কোন দিন বেলা দ্বিপ্রহরে, কোন দিন আড়াই প্রহরে, কোন দিন একেবারে অপরাহ্ণকালে ঘরে ফিরিয়া আইসে। তখন যদি ইচ্ছা হয়, দুইটা আতপান্ন প্রস্তুত করিয়া উদরদেবের তৃপ্তি সাধন করি, আর না হয় মুড়ি-গুড়-নারিকেল দ্বারা উৎকৃষ্ট জলযোগ সুসম্পন্ন করিয়া দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বিশ্রাম করি। সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা গায়ত্রী শেষ করিয়া দাওয়ায় বসিয়া গান করি—

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার-গারদে রাখিস্ বল্।—

এমন সময় হয় ত শিরোমণি ঠাকুরের মেয়ে পুঁটি আসিয়া ডাকে, "ও মামা! তুমি ব'সে গান গাইছ। বাবা বাড়ী নেই, লক্ষ্মীপুরে কালীপূজো করতে গেছেন; এ দিকে ছোট খোকা যে পাঁচ বার ভেদ হয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। শীগ্‌গীর এস, শীগ্‌গীর এস।" তখন আর কি করিব! তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শিরোমণি ঠাকুরের বাড়ীর দিকে দৌড়াই, আর মনে মনে বলি,

"ওরে, মায়া-বেড়ী কেটে এবার সংসার, আমায় দে ছেড়ে।"

এমনই করিয়া আজ ইহার বাড়ী অসুখ, কাল উহার বাড়ী শ্রাদ্ধ, পরশ্ব তাহার বাড়ী অন্নপ্রাশন; আজ ইহার ছেলেটি জন্মিল, কাল উহার মেয়েটি

মারা গেল—গ্রামের এই সব লইয়াই আছি। আমি এখন এই গ্রামের সরকারী রঘু; মান-সম্ভ্রমের কথা নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নাই, বড় ছোট নাই—বিপদে পড়িলেই রঘু; আবার সুখের সময়,—মিথ্যা কথা বল্‌তে পারব না—সুখের সময়ও রঘু। আজ মতি হাল্‌দারের নূতন পাশকরা জামাই আসিয়াছে—যা যা, রঘুকে খেতে ব'লে আয়। আজ মুখুয্যেদের নূতন গাছের কাঁঠাল পাকিয়াছে,—যা, যা, রঘুকে ব'লে আয়, আজ দুপুরে যেন এখানেই খায়। গ্রামে আছি ভাল—বেশ আছি!

কিন্তু দেখ, যত গোল বাধে আমার এই সকল পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে। আমি এই সকল পা'লপার্ব্বণ যেন দেখিতে পারি না, দেবতা লইয়া এ খেলা দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া কান্না আইসে; আমার মনে হয়, আমরা কি মানুষ—না পশু? দেবতার সঙ্গে খেলা। এই যে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়, এই সকলে আমি কখনও যোগ দিই নাই—দিবও না। কোন বাড়ীতে আমি কোন পূজায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাই না—যাইতে আমার মন সরে না। এই দেখ না, সম্মুখে দুর্গোৎসব আসিতেছে। কি প্রতারণা! কি আত্মপ্রবঞ্চনা! আর সে খেলা কি যাহাকে তাহাকে লইয়া—মা আদ্যাশক্তিকে লইয়া খেলা! তখন কাঙ্গালের সেই গান আমার মনে হয়—

শক্তিপূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হ'ত, চির দিন ভারত
শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'ত না।
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায় শক্তিপূজা হয় না;
এক মনো-বিল্বদল, ভক্তি গঙ্গাজল,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)

দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলেন না ;
কেবল জ্ঞানদীপ জ্বেলে, একান্ত ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না ;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস-বাসনা।
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাতি বিচারে শক্তিপূজা হয় না ;
সকল 'বর্ণ' এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।

এই সকল কথা ভাবিয়াই আমি কোন দিন কাহারও বাড়ীতে পূজায় যোগ দিই না ; পূজার সময় আমি আমার গৃহে বসিয়া থাকি, আর এই সব কথা ভাবি।

এবার কিন্তু আমাকে বড়ই জ্বালাতন হইতে হইতেছে। আমাদের গ্রামের হরিশ মুখুয্যে গৃহস্থ মানুষ। এতদিন কোন রকমে তাহার দিন কাটিতেছিল ; কতকগুলি ছেলে মেয়ে লইয়া ব্রাহ্মণ সংসার-ধর্ম্ম করিতেছিল। তাহার বড় ছেলেটা আজ তিন চারি বৎসর হইল নারায়ণগঞ্জে কোন এক পাটের আড়তে চাকরী করিতেছে। সে নাকি বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করিয়া থাকে। গত বৎসর দেখিলাম, সে বাড়ীতে কএক খানা বড় বড় টিনের ঘর তুলিল। যাউক, লোকের ভাল হয়, লোকের দুর্দ্দশা ঘুচে—বেশ কথা! কিন্তু এমনই করিয়া কি দুর্দ্দশা ঘুচাইতে হইবে? মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে গোপাল সামান্য লেখা-পড়াই শিখিয়াছিল। তাহাতে সে যে সৎপথে থাকিয়া এত টাকা রোজগার করে, তাহা ত আমার মনে হয় না। সেই গোপাল এবার নাকি তাহার বাড়ীতে পূজা করিবে—মহা ধুমধামে দুর্গোৎসব করিবে। শুনি-

লাম, ইহার মধ্যে সে প্রায় দেড় হাজার টাকা বাড়ীতে টপাঠাইয়াছে। পূজায় নাকি খুব আমোদ আহ্লাদ হইবে, প্রচুর আহারের আয়োজন হইবে ; কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আসিবে, আর নাকি বারাঙ্গনার দল আসিবে। তাই হরিশমুখুয্যে আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"রঘু, তুমি ত এ সবে যাও না, তা জানি ; তবে কি জান, গোপাল ত তোমার ছোট ভাইয়ের মত। মা যদি মুখ তুলিয়া চাহিয়াই থাকেন, তবে গোপালের সাধটা পূর্ণ করবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা দরকার। যা'তে পূজাটা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে হয়, তার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে। এ গাঁয়ের ব্যাপার-বিধানে তুমি না থাক্‌লে কার সাধ্য সুসম্পন্ন করে।" একবার মনে হইল বৃদ্ধকে মনের কথা বলিয়া ফেলি ; কিন্তু পারিলাম না। কোন রকমে তাঁহাকে বিদায় দিয়া ভাবিতেছি, ইহারই নাম কি দুর্গোৎসব—ইহারই নাম কি পূজা ? একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া, প্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চোরের মত তাঁহার অর্থ আনিয়া তুমি সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিবে ? আর এই পূজা মা গ্রহণ করিবেন ? এ কি চাতুরী ! এ কি প্রতারণা ! ধর্ম্মের নামে এ কি ব্যভিচার ! এ ত সহ্য হয় না !

মনটা বড়ই কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল ; বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তখন চাদরখানি কাঁধে লইয়া বাহির হইলাম। কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই ! ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে গ্রামের এক প্রান্তে রসিক হালদার মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হালদার মহাশয়ের বড়ই দুরবস্থা। সংসারে বৃদ্ধ হালদার মহাশয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, আর যুবতী পুত্রবধূ—বিধরা কি সধবা, তাহা কে বলিবে ? পুত্র দীনবন্ধু আজ সাত বৎসর হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তেইশ বৎসর বয়সের যুবক, বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন, সংসারের সম্বল ! দীন-

বন্ধু বেশ লেখাপড়া জানিত; কলিকাতার এক স্কুলে মাষ্টারী করিত; মাসে মাসে কুড়ি টাকা করিয়া বাড়ীতে খরচ দিত; সর্ব্বদা বাড়ীতে আসিত; স্বভাব-চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। পুত্রের প্রেরিত এই কুড়ি টাকা এবং দু-দশ ঘর শূদ্র যজমানের গৃহ হইতে যাহা পাওয়া যাইত, তাহাতে হালদার মহাশয়ের সংসার বেশ চলিয়া যাইত এবং তিনি বহুকালের বার্ষিক দুর্গোৎসব ক্রিয়াও যথারীতি সুসম্পন্ন করিতেন। পূজার ধুমধাম ছিল না, এমন কি ঢাক ঢোল পর্য্যন্তও আসিত না। হালদার মহাশয় নিজেই পূজার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সামান্য যাহা ভোগের আয়োজন হইত তাহা গরীব দুঃখীকে বিতরণ করিয়া হালদার মহাশয় পরম আনন্দ উপ-ভোগ করিতেন।

অকস্মাৎ কি জানি কেন, দীনবন্ধু নিরুদ্দেশ হইল। কলিকাতা হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে কোথায় চলিয়া গেল। এই সুদীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে তাহার কোন সংবাদ নাই। বৃদ্ধ হালদার মহাশয়ের কষ্টের অবধি নাই; আজকালকার দিনে কি পৌরোহিত্যে কাহারও সংসার চলে? কিন্তু বৃদ্ধ তবুও এ সাত বৎসর পূজা বন্ধ করেন নাই।

সারা বৎসর অতি কষ্টে যে দশ পনর টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখি-তেন, তাহারই দ্বারা কোন রকমে পূজা করিতেন। আমি মধ্যে মধ্যে হালদার-বাড়ীর খোজখবর করিতাম এবং যখন যাহা সাধ্য হইত দিয়া আসিতাম। হালদার-পত্নীর দুঃখে আমার প্রাণ গলিয়া যাইত।—আর সেই সোনার প্রতিমা—তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিতাম না। সেই ব্রাহ্মণ-কন্যা আশায় বুক বাঁধিয়া নীরবে এই সকল কষ্ট সহ্য করিতেন, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিতেন, আর থাকিয়া থাকিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন যাইয়া দেখি, বৃদ্ধ হালদার

মহাশয় বাহিরের অর্দ্ধ-ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই ডাকিলেন,—"রঘু, এদিকে এস বাবা!" আমি তাঁহার নিকট উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন,—"রঘু, এবার আর মাকে আনিব না, আর পূজা করিব না! কার জন্য, কিসের আশায় ঘরে থাকি রঘু! আজ সাত বৎসর দীনবন্ধুর পথ চাহিয়া আছি;—আর পারি না। দীনবন্ধু! তোমার মনে এই ছিল!" পাষাণ ফাটিয়া যেন একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বহির্গত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সময় আমার মনের অবস্থা ভাল ছিল না; তাহার পর বৃদ্ধ হালদার মহাশয়ের এই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শুনিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম, আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল! আর কি হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি, কি জানি কেন, বলিয়া উঠিলাম "দীনবন্ধু আসিবে, এই পূজার পূর্ব্বেই সে নিশ্চিত আসিবে।" কোন দিন এমন কথা আমি ভাবি নাই, কোন দিন এমন সান্ত্বনা-বাক্য আমার মুখ দিয়া বহির্গত হয় নাই। আজ কেন এমন কথা বলিয়া ফেলিলাম তাহা আমিই বলিতে পারি না। কে এমন দৈববাণী আমার মুখ দিয়া বাহির করিল?

আমার এই দৃঢ়তাপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়া বৃদ্ধ হালদার মহাশয় বলিলেন,—"কি বলিলে রঘু! এমন কথা ত তোমার মুখে কখনও শুনি নাই। দীনবন্ধু আসিবে?"

আমি অধিক দৃঢ় স্বরে বলিলাম—"হাঁ, দীনবন্ধু আসিবে।"

বৃদ্ধ তাহার পর আমার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন, কাতর বচনে বলিলেন,—"রঘুনাথ তোমার কথা ত মিথ্যা হয় না বাবা! তোমায় ত আমি অনেক দিন হইতে জানি, তুমি শাপভ্রষ্ট দেবতা। তোমার কথা ফলিবে—আমার দীনবন্ধু আসিবে।"

আমি আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না; উঠিয়া মাঠের দিকে

"আর একদিন আগে"—

সে অনেকদিন পূর্ব্বের কথা,—তখন আমি মধ্যপ্রদেশে কোন একটি সহরে ছিলাম। সহরটির নাম করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। আমি সেখানে এক হিন্দুস্থানী বন্ধুগৃহে অবস্থিতি করিতাম, কোন কাজ কর্ম্ম করিতাম না—কাজকর্ম্ম করিবার প্রয়োজনও ছিল না। আমার হিন্দুস্থানী বন্ধুটি ঐ সহরে একটি বৃহৎ কারবার খুলিয়াছিলেন। কারবারে বিলক্ষণ লাভ হইত। তিনি পরিবার লইয়া বাস করিতেন না। একমাস কি দুইমাস অন্তর সুবিধামত ছত্রিশগড়ে তাঁহার বাড়ীতে যাইতেন; পাঁচ সাত দিন পরেই আবার ব্যবসায়ের স্থলে চলিয়া যাইতেন।

পৃথিবীতে আমার আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না। ছয় মাসের মধ্যে পিতা, মাতা ও একমাত্র ভগিনী পরলোকে চলিয়া যাওয়ায় আমি একেবারে সর্ব্ববন্ধনশূন্য হইয়াছিলাম। তখন আমার বয়স একুশ বৎসর। বাবা ছত্রিশগড়ে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতেন। সেইখানেই তিনি একখানি ছোট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। হুগলি জেলার এক গ্রামে আমাদের যে একখানি পৈতৃক বাড়ী ছিল—সে বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বাবার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা সেই পৈতৃক ভূমিটুকু গ্রামের একজনকে দান করিয়াছিলেন। ছত্রিশগড়েই আমার জন্ম। সেখানকার ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই আমি পাঠ শেষ করি। বাবা আমাকে তাঁহার

আফিসে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিয়া দেন। তাহার পরেই তিনি শীতের সময় তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া আমার একটি বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করেন। সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, পুত্র-বধূর মুখ নিরীক্ষণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিবার পূর্ব্বেই, তিন দিনের জ্বরে আমার মাতাঠাকুরাণী স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমাদের আর কলিকাতায় যাওয়া হইল না।

দুর্ভাগ্য কখনও একাকী আইসে না। মাতার মৃত্যুর একমাস পরেই কাপড়ে আগুণ লাগিয়া আমার ছোট ভগিনী সুরমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইয়া গেল। চিকিৎসার ত্রুটী হইল না; কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারা গেল না। পাঁচদিন ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমার বড় আদরের ভগিনীটি মায়ের কাছে চলিয়া গেল। আমি মনে করিলাম এইবার আমার পালা। আমি চলিয়া গেলেই বাবার বন্ধনমুক্তি—জীবনান্ত ছুটি! আমি ভাবিলাম এক, বিধাতা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ঠিক তাহার উল্টাটি। মায়ের মৃত্যুর পর প্রায় ছয়মাস পরে একদিন আফিশ হইতে আসিয়া বাবার জ্বর হইল। এই জ্বরই তাঁহার কাল হইল। মায়ের মত তিন দিন জ্বরে ভুগিয়া তিনি আর এক লোকে চলিয়া গেলেন—আমি চিরজীবনের মত ছুটি পাইলাম; আমার বলিতে কেহ থাকিল না। এ কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না।—আমার বাল্যবন্ধু—আমার যৌবনের সখা প্রতাপনারায়ণ সিং আমাকে তাহার স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করিল। মনে করিয়াছিলাম, সকল বন্ধন যখন খসিয়া গেল, তখন যে কয়দিন বাঁচি, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাটাইয়া দিব। প্রতাপনারায়ণ আমাকে সে পথের পথিক হইতে দিল না;—আমি তাহারই গৃহে আশ্রয় লাভ করিলাম। বাড়ীখানি বেচিতে চাহিয়াছিলাম—প্রতাপনারায়ণ বেচিতে দিল না। এক ভদ্রলোক মাসিক ত্রিশ টাকায় বাড়ীখানি ভাড়া লইলেন।

ঐ ত্রিশটি টাকা, আর পিতৃসঞ্চিত দুই হাজার টাকা আমার সুদীর্ঘ জীবন-পথের পাথেয় হইল।

প্রতাপনারায়ণের পিতা যথেষ্ট নগদ টাকা ও কিছু ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রতাপনারায়ণ এতদিন বাড়িতে বসিয়াই ছিল। আমি যখন তাহার আশ্রয়ে গেলাম, তখন তাহার কোন একটা কারবার করিবার ইচ্ছা হইল। তাহার এক আত্মীয় তাহাকে মধ্যপ্রদেশে তূলার কারবার করিবার পরামর্শ দিল; তাই সে মধ্য প্রদেশের এই সহরে আসিয়া তূলার কারবার আরম্ভ করিয়াছে। আমি আর কি করিব?—ভবঘুরে বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছি। কখনও কানপুর, কখনও দিল্লী, কখনও এলাহাবাদ, কখনও কলিকাতায় কাটাই। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ক্লান্তি বোধ হয়, তখন মধ্য-প্রদেশের এই সহরে বন্ধুর প্রবাসগৃহে আসিয়া হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করি।

এই সহরে সাড়ে তিনঘর বাঙ্গালী ছিলেন। ষোলআনা তিনঘর, আর আমি আধ ঘর। বাঙ্গালা দেশের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও আমি বাঙ্গালী। জীবনের এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিম দেশীয় লোকের সহিত কাটাইলেও এক প্রতাপনারায়ণ ব্যতীত হিন্দুস্থানিদিগের মধ্যে আমার আর কোনও বন্ধু ছিল না; কিন্তু এই সহরে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিলেও এখানকার তিনঘর বাঙ্গালী আমার পরমাত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেন বলিতে পারি না,—পশ্চিমাঞ্চলে আজন্ম বর্দ্ধিত এই তিনঘর বাঙ্গালীর ক্রিয়াকলাপ, আমোদ আনন্দ প্রভৃতিতে যোগদান করিয়া আমি বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিতাম। এই তিন বাড়ীর বাঙ্গালী বাবুদের পরিচয়-পত্র লইয়া কলিকাতায় তাঁহাদের আত্মীয়গণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমি পরম সুখানুভব করিতাম। আজন্ম পশ্চিমে প্রতিপালিত হইয়াও আমি হিন্দুস্থানী হইতে পারি নাই,

বাঙ্গালীকেই আমার আপনার জন বলিয়া মনে হইত। ইহা কি রক্তের টান?

ভূমিকা করিতেই এতক্ষণ গেল। এখন যাহা বলিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা, তাহারই অনুসরণ করি। এক বৎসর গ্রীষ্মকালে প্রতাপনারায়ণের একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল। এবার এই সহরবাসী শ্রীযুক্ত বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় তাঁহার জামাতার বাড়িতে থাকিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বামাচরণ বাবু জাতিতে বাঙ্গালী বটে—কিন্তু ধর্ম্মে না হিন্দু—না মুসলমান—না খৃষ্টান—না ব্রাহ্ম। তিনি কিছুই মানিতেন না,—সকল জাতির অন্নই আহার করিতেন—কোন প্রকার পূজা, উপাসনা প্রভৃতি কিছুই তাঁহাকে করিতে দেখিতাম না। বয়সও কম হয় নাই—এক প্রকার বৃদ্ধ বলিলেও হয়। সিভিল ম্যারেজ আইনানুসারে তিনি কলিকাতার একটী বাবুর সহিত তাঁহার বড় মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, বাবুটী নাকি কায়স্থের ছেলে। বামাচরণ বাবু বিপত্নীক। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না—দুইটী কন্যা। বড় কন্যা বিবাহিতা—ছোট কন্যাটির বয়স সতর বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—ভালছেলে না পাওয়ায় বিবাহ দিতে পারেন নাই। আমরা যখন ছত্রিশগড়ে ছিলাম, তখন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সরকারী কার্য্যোপলক্ষে সেখানে বাস করিতেন! তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার একটি পুত্র এম, এ পাশ করিয়া কলিকাতার এক কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। আমার সহিত তাঁহার বিশেষ জানাশুনা ছিল। কথাপ্রসঙ্গে এই ছেলেটির কথা জানিতে পারিয়া বামাচরণ বাবু তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে আমি সেই অধ্যাপককে পত্র লিখি এবং মেয়েটীর ফটোগ্রাফও

পাঠাইয়া দিই। এই বার যখন কলিকাতায় যাইতেছিলাম, তখন আমাকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করিবার জন্যই তিনি তাঁহার বড় জামাতার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন এবং যাইবার সময় বিশেষভাবে বলিয়া দেন যে, আমি যেন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের কথাটা পাকা করিয়া আসি।

আমি কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমে প্রতাপনারায়ণের কার্য্য শেষ করিলাম; তাহার পর একদিন সেই অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের কথা প্রায় পাকা করিয়া ফেলিলাম। অধ্যাপক মেয়েটীকে একবার দেখিবার অপেক্ষা মাত্র রাখিলেন। কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে বামাচরণ বাবুর এক টেলিগ্রাম পাইলাম,—তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে,—নম্বর ওয়েলেস্‌লি লেনে একটী খৃষ্টান মহিলা আছেন; তাঁহাকে যেন আমি সঙ্গে লইয়া যাই। বামাচরণ বাবুর এই টেলিগ্রামের সম্যক্ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমি সেই দিনই আহারান্তে ওয়েলেস্‌লি লেনে সেই মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। মহিলাটি আমার নিকট তাঁহার যে পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন। আটবৎসর বয়সে এক বৃদ্ধের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; নয় বৎসর বয়সের সময় তিনি বিধবা হন। তাঁহার এক মাতুল কলিকাতায় বড় চাকুরী করিতেন। তিনি সেই মাতুলের নিকট আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং মাতুল কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে খৃষ্টান মহিলা প্রত্যহ আসিতেন, তিনি তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর, তখন তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তিনি তখন গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সেই খৃষ্টান মহিলার আশ্রয় লাভ করেন— তাহার পর খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একটী বাঙ্গালী

করিলাম এবং পথে এক বন্ধুর গৃহে দুইদিন অপেক্ষা করিয়া চতুর্থ দিনে মধ্য-প্রদেশের সেই সহরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

বাসায় পৌঁছিয়া স্নান-আহার ও বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণকালে বাঙ্গালী-বাবুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইলাম। আমার বাসা হইতে বামাচরণ বাবুর বাড়ী প্রায় এক মাইল দূরে। কিছুদূর অগ্রসর হইলে রাস্তার মধ্যে বামাচরণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি মতিবাবু, কবে এলেন ?"

আমি বলিলাম,—"এই আজ সকালে এসে পৌঁছেছি।"

তিনি বলিলেন—"আহা! বেচারীকে আপনি কি কষ্টই দিয়েছেন। আপনি সেদিন দশটার সময়:তার ওখানে যাবেন, ঠিক ক'রে এলেন। দশটা বেজে গেল—সাড়ে দশটা হল,—এগারটা বাজে, তবু আপনার দেখা নেই।—বেচারী প্রস্তুত হ'য়ে পথে চেয়ে ছিল। এগারটার সময় যখন আপনি গেলেন না, তখন সে আর কি করে—জিনিষপত্র নিয়ে একেলাই গাড়ী ক'রে ষ্টেসনে এল—মনে করেছিল, হয় ত ষ্টেসনে আপনার সঙ্গে দেখা হবে!—ষ্টেসনেও যখন আপনার দেখা পেলে না, তখন আর কি করে—একেলাই চ'লে এসেছে। আহা রোগী মানুষ!—এতদূর পথ কখনও আসেনি—তার পরে স্ত্রীলোক—একেলা! রাস্তার ভারি কষ্ট—ভারি অসুবিধা হয়েছিল।—তা আপনি এমন করলেন কেন ?"

আমি বলিলাম—"যে দিন কথাবার্ত্তা ঠিক করে এলুম, সেই দিনই বাসায় গিয়ে এক বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়া প্রয়োজন- হয়ে পড়ল। তাই সেই রাত্রির গাড়ীতেই আমাকে কলিকাতা ছাড়তে হয়েছিল। এই সংবাদটা ওঁকে দেবার জন্য আপনার জামাইকে বলে এসেছিলাম।"

বামাচরণবাবু বলিলেন—"সে আবার খবর দেবে!—কিচ্ছু না!—যাক্ সে কথা, প্রমীলার বিয়ের কি ঠিক করে এলেন ?"

আমি অতি সংক্ষেপে সে সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন ; আমিও বামাচরণবাবুর প্রতিবেশী হরিশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অন্যান্য কথার পর হরিশবাবু বলিলেন, "আরে শুনেছ মতি! ভারি এক মজা হয়ে গিয়েছে। আজ দিন দুই তিন হ'ল, একটা মাগী এসে বামাচরণবাবুর বাড়ীতে হাজির। বুড়ী নয় হে—যুবতী! কে জানে বাপু, কি জাত। খৃষ্টান-টৃষ্টান কিছু হবে! আমাদের বাড়ীর মেয়েরা ত আর ওদের বাড়ী যায় না—সব কথাও জানা যায় না! দূর হোক সে কথা। আমি পরশু দিন বামাচরণ বাবুকে ডেকে বল্লুম, 'দেখুন মশাই আমরা গেরস্ত মানুষ, মেয়েছেলে নিয়ে বাস করি। আপনি যে আপনার বাড়ীতে কোথাকার কে একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে এসে রেখেছেন—আর দিনরাত হার্ম্মোনিয়াম বাজছে, গান চল্‌ছে—এ সব আমরা কি করে সয়ে থাকি!—আপনার বাড়ীতেও যুবতী মেয়ে আছে—আপনিই বা কি করে এ সব প্রশ্রয় দেন! শুনলুম, সে আপনার আত্মীয়-কুটুম্ব নয়। এনেছেন, বেশ করেছেন—নিন্দা-কলঙ্কের ভাগী আপনিই হবেন। কিন্তু তাকে ভদ্রপল্লীর মধ্যে রাখ্‌তে পার্ব্বেন না। পাশাপাশি বাড়ী—এ কিছুতেই হবে না। জানেন ত এ পাড়ার বদমাইসেরা কেমন! তারা যদি ক্ষেপে ওঠে, তা'হলে আপনার মান বাঁচান ভার হবে।' বামাচরণবাবু আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুখ ভার ক'রে চলে গেলেন। আজ শুনলুম নয়াগঞ্জে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে তাকে সেখানে তফাৎ করেছেন। বাঁচা গিয়েছে। দেখ দেখি বাপু আক্কেলটা! বুড়া মানুষ—ঘরে এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে!—আর তোর এই মতিগতি!—ছি—ছি—ছি!" আমি আর কোন কথা ভাঙ্গিলাম না। খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া আসিলাম।

দশ পনর দিন যায় ; আমি প্রায়ই বাঙ্গালী বাবুদের পাড়ায় যাই—বামাচরণবাবুর বাড়ীতেও যাই ; কিন্তু সে স্ত্রীলোকটীর কথা আর জিজ্ঞাসা করি না। একদিন অপরাহ্ণকালে বাজারের দিকে বেড়াইতে গিয়াছি—পথের মধ্যে একটী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি এখানকার আদালতে চাকুরী করেন—প্রতাপনারায়ণের ওখানে সর্ব্বদাই যাতায়াত করেন—তাই আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবুজী, বামাচরণবাবুকো সাদিমে আপনা লোগাঁকো জরুর নিমন্ত্রণ্ হোগা।"

আমি বলিলাম—"বামাচরণ বাবুকো সাদি !—আপ্ কেয়া বোলতে হেঁ !"

তিনি তখন বলিলেন যে, বামাচরণবাবু সিভিলম্যারেজ-আইন অনুসারে কোন একটী খৃষ্টান যুবতীকে বিবাহ করিবেন। আইন অনুসারে বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে কাছারীতে নোটিশ দিতে হয়, তাই সে দিন নোটিশ দিয়া গিয়াছেন। বিবাহের দিন যথারীতি রেজেষ্টারী হইয়া বিবাহ হইবে।

কথাটা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। বুড়া বামাচরণবাবুর উপর বড়ই রাগ হইল। সতর বৎসর বয়সের আইবুড়ো মেয়ে ঘরে—তাহার বিবাহের খোঁজ নাই—এ দিকে পঞ্চান্ন বৎসরের বুড়া বিবাহ করিতে যাইতেছেন ! আমি বাজারের দিকে না গিয়া বামাচরণবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে এই বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অম্লানবদনে বিবাহের কথা স্বীকার করিলেন। আমি তখন বলিলাম, "আমি আপনার বিবাহে বাধা দিতে আসি নাই। আপনি একটা কেন, সাতটা বিবাহ করুন, তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই রকম একটা কিছু হবে—আপনার জামাতা আমার মনে এই সন্দেহ

জন্মাইয়া দেওয়ায় আমি ইচ্ছা করিয়াই ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে আনি নাই। তবে আপনাকে একটি কথা বলিয়া যাই যে, আপনার কন্যার জন্য আমি যে বিবাহ স্থির করিয়াছিলাম, আপনি এই কার্য্য করিলে আমি সে বিবাহ কিছুতেই হইতে দিব না। আপনার এই বিবাহের কথা শুনিলে, আমার বন্ধু যে আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হবেন না, এ কথা আমি নিশ্চয়ই জানি। আমার কথা আমি বলিয়া গেলাম, এখন আপনি যা খুসি তাই করিতে পারেন।—" এই কথা বলিয়াই আমি সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

তাহার পর তিন চারি দিন আর আমি বাঙ্গালী বাবুদের পাড়ায় যাই নাই। আমাকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত দেখিয়া একদিন অপরাহ্ণকালে হরিশবাবু আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "আর! শুনেছ হে মতি! বামাচরণ বাবুর বিয়ে যে ভেঙ্গে গেল।"

আমি বলিলাম—"কি রকম!"

হরিশবাবু বলিলেন—"তুমি আবার ন্যাকা সাজ্‌ছ কেন? বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল—কাছারীতে নোটীশ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছিল—আর মাঝখান থেকে তুমি এসে তাঁকে ভয় দেখিয়ে গেলে যে, তিনি যদি এই বিয়ে করেন, তাহ'লে তাঁর মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে দেবে।—সেই দিন থেকে বামাচরণ বাবু আর ও-মুখো হন না। শুনলুম বামাচরণবাবু সেই খৃষ্টান্‌নীটাকে বিবাহ কর্ব্বেন না বলে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। বামাচরণ-বাবুর চাকর কা'ল আমাকে বলছিল যে, সে সেই স্ত্রীলোকটার বাড়ী গেলে, স্ত্রীলোকটা অনেক কান্নাকাটা করেছিল—আর বামাচরণবাবু যাতে তার সঙ্গে একবার দেখা করেন, তার জন্য অনেক ক'রে অনুরোধ করে পাঠিয়ে-ছিল। চাকরের কাছে এই কথা শুনবার পরও না কি বামাচরণবাবু

সেই দিকে যান নাই! তোমার বাপু, বসেত আর কাজ নেই—নিজে ত বিয়ে থাওয়া কল্লেই না, আর কেউ যে বিয়ে করে ঘর সংসার করে, তাও যে তুমি দেখ্‌তে পার না।”

হরিশবাবুর সঙ্গে যে দিন আমার কথাবার্ত্তা হয়, তার পর দিন প্রাতঃকালে আমি বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময় বামাচরণবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাকে বলিলেন, “মতিবাবু শিগ্‌গির কাপড় নিয়ে বেড়িয়ে আসুন, বিশেষ দরকার।” আমি দেখিলাম তিনি হাঁপাইতেছেন—তাঁহার মুখ চোখের অবস্থা কেমন হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম বিশেষ কোন বিপদে পড়িয়াই তিনি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছেন। আমি ব্যস্তভাবে বলিলাম “কি হয়েছে, বলুন না।” তিনি বসিলেন, “আপনি আর বিলম্ব করবেন না, রাস্তায় সব বল্‌ব।” আমি তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রাস্তায় আসিয়াই তিনি বলিলেন, “মতি বাবু সর্ব্বনাশ, হয়েছে। এইমাত্র খবর পেলুম, মিসেস দাস নাকি বিষ খেয়েছেন। যে চাকর খবর নিয়ে এসেছিল, তার মুখে শুনলুম যে, এখনও তার দেহে প্রাণ আছে। আমি তাকে ডাক্তারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েই দৌড়ে আপনার কাছে এসেছি। দেখুন, যে করে হোক, তাকে বাঁচাতে হবে।” আমি বলিলাম, “তা হলে একটু তাড়াতাড়ি চলুন।—ডাক্তার যদি এখনি এসে পৌছায়—আর যদি বেশী বিলম্ব না হয়ে থাকে—আর বিষও যদি তেমন তীব্র না হয়, তা হ’লে হয় ত তাকে বাঁচাতে পারা যাবে।” বৃদ্ধ বামাচরণবাবু আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “মতিবাবু, এখন সব কথা ভুলে যান—এখন শুধু মনে রাখুন যে, এই বিদেশে একটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক নিজের প্রাণনাশ করতে বসেছে।” আমি বলিলাম, “সে সব কথা এখন মনে করবার সময় নয়। যা হবার তা হয়ে গেছে, আমরা থাক্‌তে, তাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেব না।” বৃদ্ধ বামাচরণবাবুর সে সময়ের

অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহারই জন্য যে, একটী স্ত্রীলোক নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, এই কথা ভাবিয়া আমি বড়ই কাতর হইলাম। আর এ ব্যাপারে আমিও ত একেবারে নিরপরাধ নাই।—যদি তাহাকে বাঁচাইতে না পারি—যদি আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব ? আমার ত মনে হইল—স্ত্রীলোকটী মরিয়া গেলে আমি আমাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ মনে করিতে পারিব না।—বেশী কথা ভাবিবার তখন অবকাশ ছিল না। আমরা দুইজনে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। আমি যুবক, তিনি বৃদ্ধ—তিনি আমার সঙ্গে চলিয়া উঠিতে পারিবেন কেন ?—আমি বলিলাম, "আপনি পাছে আসুন, আমি একটু আগেই যাই।"

সেই বাড়ীতে পৌছিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইল না! কি বলিয়া মরণ-পথ-যাত্রী রমণীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইব ? তাহার যদি তখনও জ্ঞান থাকে,—তাহার যদি তখনও কথা বলিবার শক্তি থাকে ; তাহাও হইলে সে যদি বলিয়া বসে, "আপনিই আমার মৃত্যুর কারণ"—তাহা হইলে তাহাকে আমি কি বলিব ? কেমন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আমি দাঁড়াইয়া থাকিব ? আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। ঘরের মধ্যে হয় ত রমণী মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে,—কিন্তু আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইবার সাহস পাইলাম না।

আমি পৌছিবার দুই তিন মিনিট পরেই বামাচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অন্য পথ দিয়া ডাক্তারওআসিয়া পড়িলেন। তখন আমরা তিন জন রমণীর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলাম।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রীলোকটী যে খাটিয়ায় শয়ন করিয়া ছিল, ডাক্তার বাবু সেই খাটিয়ার নিকটে গেলেন। তিনি স্ত্রীলোকটীকে দেখিবামাত্রই বলিলেন, "এ যে আফিং খেয়েছে।" তার পর স্ত্রীলোকটীকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি খেয়েছ ?" সে কথা বলিল না। তখন তাহার দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িল—সে একদৃষ্টিতে বামাচরণ বাবুর দিকে চাহিয়া রহিল। এই সময় আর একটি লোক stomach-pump ও অন্যান্য দ্রব্য হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি সেই লোকটার হাত হইতে শিশি লইয়া সেই শিশির ঔষধ স্ত্রীলোকটিকে খাওয়াইতে গেলেন। স্ত্রীলোকটির তখনও অল্প কথা বলিবার শক্তি ছিল। সে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "No, let me pass away" বামাচরণবাবু তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ; দৌড়িয়া সেই খাটিয়ার উপর পড়িলেন,—কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "রোহিণী, আমায় ক্ষমা কর, তুমি বাঁচ—আমি আর তোমায় ছেড়ে যাব না।"

রোহিণী এতক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। বুঝি বামাচরণবাবুকে একবার দেখিবার জন্য—তাহাকে একটি কথা বলিবার জন্য এতক্ষণ তাহার প্রাণ বাহির হয় নাই—সে তাহার প্রাণকে বাহিরে যাইতে দেয় নাই। এইবার তাহার শেষ। তাহার সমস্ত জীবনী শক্তি একত্র সংগ্রহ করিয়া সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"আর-এক-দিন—আ—গে—"

তাহার পরই সব শেষ! আমি চাহিয়া দেখিলাম, তাহার দৃষ্টি আমার দিকে।—আমি সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলাম না ;—সে দৃষ্টি যেন আমাকে কঠোর তিরস্কার করিতে লাগিল ;—আমি মরণাহতের মত সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর কত দিন গিয়াছে, কত বৎসর অতীত হইয়াছে ; কিন্তু যখনই সেই দিনের কথা স্মরণ হয়, তখনই দেখিতে পাই, যেন সেই দুইটি চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া আছে।

নসীবের লেখা।

(১)

"ওরে অলপ্পেয়ে, ভাত ভাত যে করিস্, ভাত আসে কেমন ক'রে, তার কোন খবর রাখিস্ ?"

মায়ের মুখে এই রূঢ় কথা শুনিয়া পুত্র অলিমদ্দী ছলছল নয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর অতি কাতরস্বরে বলিল; "হারু পরামাণিক কা'ল যেতে ব'লেছে মা! কা'ল থেকে তাদের কাজ ক'রব।"

মাতা বলিলেন, "আবার তাদের একটা গরু হারিয়ে যাক্, তাই নিয়ে শেষে হেঙ্গাম হুজ্জুত হ'ক।"

অলি বলিল, "মা, মণ্ডলদের ছাগল ত আর আমার দোষে হারায়নি। আমি কত ব'ল্লাম যে, আমি তেরটা ছাগল এনে খোঁয়াড়ে বন্ধ ক'রেছিলাম। রাত্তিরে কে একটা নিয়ে গেল, ওরা বলে আমি মাঠে হারিয়ে এসেছি। মণ্ডলের বৌ আবার বল্লে যে, আমি চুপে চুপে ছাগলটা বেচে ফেলেছি। তাইতে ত ওদের বাড়ীর রাখালী ছেড়ে দিলাম।"

মাতা বলিলেন, "এখেনেও যদি অমনই হয়, তখন কি হবে?"

অলি বলিল, "মা, তা হ'লে বুঝব আল্লা আমার নসীবে এই সব লিখেছেন।"

মাতা তখন একটু কোমলস্বরে বলিলেন, আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে তোরে বকি; কার ভাত খাচ্চিস্ তা জানিস্ ত।"

অলি বলিল, "সেই জন্যই ত মা, তোমারে আবার নিকে পুষতে

বারণ ক'রেছিলাম ; তুমি ত সে কথা শুনলে না, তুমি একই কথা ধরলে 'তোর একটা হিল্লে হবে'। কেমন, আমি তখন বলিনি ?"

মাতা কোন উত্তর করিলেন না, একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা আল্লা !"

(২)

অলিমদ্দী সাধু সেখের ছেলে। সাধু জমিদার-বাড়ীর সর্দ্দার ছিল। সাধুর মত পাকা খেলওয়াড় তখন কাল্‌না অঞ্চলে ছিল না ; একখানি লাঠি লইয়া দাঁড়াইলে সাধু সর্দ্দার পঞ্চাশজন লাঠিয়ালের মহড়া লইতে পারিত। একবার তাহার মনিব-জমিদারের সহিত আর এক জমিদারের একটা হাট লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদ উপলক্ষে একটা প্রকাণ্ড দাঙ্গা হয়। সাধু সর্দ্দার সেই দাঙ্গায় একাকী সতর জন লোককে গুরুতর জখম করিয়া পলায়ন করে এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, সাঁতার দিয়া গঙ্গাপার হইয়া কাল্‌নার থানার দারোগা সাহেবকে সেলাম করিয়া বাড়ী যায়। তারপর যখন সাধু সর্দ্দারকে আসামী করা হইল, তখন স্বয়ং দারোগা সাহেব সাক্ষ্য দিলেন যে, ঘটনার সময় সাধু সর্দ্দার কাল্‌নার থানায় উপস্থিত ছিল। সাধু বেকসুর অব্যাহতি লাভ করিল। এমন দাঙ্গা হাঙ্গামা, খুন জখম সাধু সর্দ্দার অনেকবার করিয়াছিল, কিন্তু সে কখনও বিপদে পড়ে নাই।

সাধু অনেক দিন বিবাহ করে নাই ; কেহ তাহার বিবাহের কথা তুলিলে সে তাহার লাঠিখানি দেখাইয়া বলিত, "এরই সাথে আমার সাদী হ'য়েছে।" তাহার পর যেবার স্বরূপগঞ্জে একটা দাঙ্গা হয়, সেই দাঙ্গার পর মনিরদ্দী বিশ্বাসের খুপসুরত বেটীকে দেখিয়া সাধুর বিবাহের ইচ্ছা হয়। সাধু সর্দ্দারের মত জামাই পাওয়া খুব জোর কপালের কাজ। মনিরদ্দী সাধুর

সাধু সর্দার কালনার থানার দারোগা সাহেবকে সেলাম করিতেছে।

হাতে কন্যার ভাব সমর্পণ করিয়া ইহলোকের কাজ শেষ করিল। মেয়ের বিবাহের জন্যই বোধ হয় তাহারা স্বামীস্ত্রীতে এতদিন বাঁচিয়া ছিল। বিবাহের একমাস পরেই মনিরদ্দী ও তাহার স্ত্রী বোধ হয় পরামর্শ করিয়া একদিনেই দশঘণ্টা আগেপাছে এই দুনিয়ার কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেল।

এত বড় যোয়ান, এমন পাকা সর্দ্দার! কিন্তু এই এক মাসের মধ্যেই নবপরিণীতা যুবতী পত্নীর উপর তাহার একটা নেশা জন্মিয়াছিল! সাধুর আপনার বলিতে কেহ ছিল না। যখন এতকাল পরে সে বিবাহ করিল, তখন সে মনে ভাবিয়াছিল, বৌ তার বাপমায়ের কাছে থাকিবে; সে নিশ্চিন্তমনে বাবুর বাড়ী সর্দ্দারী করিবে, আর যখন তখন এই সামান্য দশক্রোশ পথ দেখিতে দেখিতে পার হইয়া স্বরূপগঞ্জে আসিবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় তার উল্‌টা। সাধুর এ সংসারে লাঠিখানা ছাড়া আর কিছু ছিল না; বেশ দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। শেষে চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহের খেয়াল তাহার মাথায় চাপিল। বিবাহ করিবার একমাস পরেই একটি সুন্দরী যুবতী পত্নীর সম্পূর্ণ ভার তাহার মাথায় পড়িল। সর্দ্দার তখন মহা গোলে পড়িল।

তাহার মনিব বলিলেন, "সাধু, স্বরূপগঞ্জের বাড়ীঘর জমাজমি বেচিয়া এখানে বাড়ী কর; আমরা জমি দিচ্ছি, ঘর তুল্‌বার খরচ দিচ্ছি।"

সাধু তাহার স্ত্রীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল; সাধু-পত্নী এ সাধু প্রস্তাবে সম্মত হইল না; সে বলিল, "ও ব্যবসা ছেড়ে দেও; দাঙ্গা ফেসাদ ক'রে কবে গারদে যাবে, তখন আমার কি হবে? তার চাইতে এখানে চ'লে এস। বাবা যে জমিজমা রেখে গেছেন, তাই চাষ

আবাদ কর ; তাতেই বেশ দিনগুজরাণ হবে। ও সব লাঠালাঠির আর দরকার নেই।"

অন্য সময় হইলে অন্যের মুখে শুনিলে সাধু এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিত না ; কিন্তু এই এক মাসেই সাধু সর্দ্দারের লাঠির বহর একহাত কমিয়া গিয়াছিল ; যে সাধুর কোন পরওয়া ছিল না, সেই সাধু এই এক মাসের মধ্যেই আর এক রকম হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর কথা শুনিয়া সাধু অনেকক্ষণ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ভাবিল ; তাহার পর বলিল, "যা'ক্, সেই ভাল। আর ও-সব ভালও লাগে না।"

সে তাহার পর জমিদারের কর্ম্ম ত্যাগ করিল। জমিদার মহাশয় কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে তাহার পরিবারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না ; জমিদার বাবুকে সেলাম করিয়া বলিল, "কর্ত্তা মশাই, বড় একটা কিছু বাধ্‌লে খবর দেবেন, সাধু লহমার মধ্যে দশ কোশ পথ উড়ে আস্‌বে।"

সাধু সর্দ্দার তখন পাকা বাঁশের লাঠি তিনখানি ঘরের কোণে ফেলিয়া দিল ; শ্বশুরের লাঙ্গল গরু লইয়া চাষের কার্য্যে মন দিল। গ্রামের কেহ কখন সাধুকে লাঠি খেলিতে বলিলে সাধু বলিত, "সে সব গঙ্গাপারে রেখে এসেছি ; ও কর্ম্ম আর না।"

এক বৎসর পরেই সাধুর একটি পুত্রসন্তান হইল। সাধু তাহার নাম রাখিল অলিমদ্দী। সেখ—সর্দ্দার উপাধিটাও সে মুছিয়া ফেলিল। দশ বৎসর সুখে কাটিয়া গেল ; সাধুর আর সন্তান হইল না।

সাধুর স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল অলিকে চাষের কাজে নিযুক্ত না করিয়া হয় লাঠিখেলা শিক্ষা দেওয়া হউক, অথবা তাহাকে পাঠশালায় দেওয়া হউক। সাধু এই দুই প্রস্তাবেই অসম্মত হইয়াছিল ; সে বলিয়াছিল "দেখ বৌ, লাঠিখেলা আমি আর ওকে শিখাব না। যে দিন কা'ল

পড়েছে, তাতে ও কসরত আর শিখে কাজ নেই ; দাঙ্গা ফেসাদ এখন আর শিখে কাজ নেই ; দাঙ্গা ফেসাদ এখন আর চল্‌বে না। কোম্পানীর কাছে গেলেই যখন সকল গোলের রফা হয়, তখন ও সব আর দরকার হবে না। তবে লেখাপড়া,—তা দেখ, আমাদের চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখ্‌লে বাবুভেয়েদের মত হ'য়ে যায় ; বাপ বড়বাপের চাষ আবাদের দিক বড় নজর দেয় না। লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেটার পায়া ভারি ক'রে কাজ নেই। আর এখনও ত ওর উমর এগার বছর। এখন ও খেলা ক'রেই বেড়াক। আমি যে কয়দিন আছি, সে কয়দিন ওকে আর ভাব্‌তে হবে না। তারপর আমাদের এই জমাজমি চাষ আবাদ ক'রেই ও বেশ দিনগুজরাণ কর্‌তে পার্‌বে।" সুতরাং অলিমদ্দী কোন কাজই করিত না ; সময়মত বাড়ীতে আসিয়া আহার করিত, আর নিজের মনে খেলা করিয়া বেড়াইত।

এই সময়ে একদিন সাধুর শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হইল ; রাত্রিতে কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তিন দিন আর সে জ্বর ছাড়িল না। চতুর্থ দিনে অলিমদ্দী কবিরাজ ডাকিয়া আনিল ; কবিরাজ সাধুকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "জ্বর আজই কমে যাবে, কিন্তু গায়ে বোধ হয় ঠাকরুণ বাহির হইবে।"

কবিরাজের কথাই ঠিক হইল, সাধুকে বসন্তরোগে ধরিল। দশদিন চিকিৎসার পর সাধু স্ত্রীপুত্রকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। সাধুর স্ত্রী নাবালক ছেলেটি লইয়া অকূল সাগরে পড়িল ; কেমন করিয়া দিনপাত হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

(৩)

তখন পার্শ্বের গ্রামের জমির সেখ তাহাদের বাড়ীতে বড়ই আনাগোনা আরম্ভ করিল। সাধুর স্ত্রীর বয়স তখনও ত্রিশ বৎসর হয় নাই ; তাহার

সৌন্দর্য্যও তখন যায় নাই। জমির সাধুর স্ত্রীকে একদিন বলিল, "দেখ, তোমাদের বড় কষ্ট হচ্চে। যে জমাজমি আছে, ছেলে মানুষ কি তা রক্ষা কর্‌তে পারবে, বার ভূতে সমস্ত লুটে খাবে। তার চাইতে এক কাজ কর। আমি তোমাকে নিকে করি। আমার যে দুচার বিঘে জমি আছে, তার সঙ্গে তোমাদের জমিও চাষ আবাদ করব, তা হ'লে যেমন ভাবে তোমাদের চলে যাচ্ছিল, তাই হবে, কোন কষ্টই হবে না ; ছেলে-টাও মানুষ হবে।"

জমিরের এ প্রস্তাব সাধুর স্ত্রীর ভাল বোধ হইল না ; সে বলিল, "না, আর আমি নিকে ক'রব না। কষ্টেস্থষ্টে ছেলেটাকে মানুষ করতে পার্‌লে আর আমাদের দুঃখ থাক্‌বে না। তুমি যদি একটু দয়া কর, তা হ'লে আমাদের জমি থেকে যা হবে, তাতেই আমাদের বেশ চলে যাবে। কি বল ?"

জমির বুদ্ধিমান ছিল ; সে মনে করিল, তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই; দুচারি মাস যাকই না ; তখন দেখা যাইবে।

জমির যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই হইল। তাহার প্রলোভনে সাধুর স্ত্রীর সঙ্কল্প ঠিক রহিল না। একদিন সে জমিরকে নিকা করিতে সম্মত হইল। এগার বৎসরের ছেলে অলিমদ্দী যখন শুনিল যে, তাহার মায়ের সহিত জমিরের নিকা হইবে, তখন সে মাতাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে বলিল, "তোর ভালর জন্যই এ কাজ কর্‌ছি ; এতে তোর একটা হিল্লে হবে, নইলে যা-কিছু আছে সব বেহাত হ'য়ে যাবে।" অলিমদ্দী মায়ের বিবাহে আগ্রহ দেখিয়া নীরব হইল।

তাহার পর যথাসময়ে অলিমদ্দীর মাতার সহিত জমিরের বিবাহ হইয়া গেল। অলিমদ্দীর মাতা তাহাদের বাড়ী ঘর দুয়ার বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে লইয়া জমিরের বাড়ীতে উঠিয়া গেল। তখন জমির নিজ মূর্ত্তি

ধারণ করিল। সে ইতঃপূর্ব্বেই জমিদারের নায়েবের সহিত পরামর্শ করিয়া সাধুর জমি কয়খানি গ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এখন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

একদিন জমির বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এ সব কি ব্যাপার, বুঝতে পারি না। তোমাদের জমির আজ তিন বৎসরের খাজনা বাকি, তা ছাড়া বকেয়া বাকীও অনেক টাকা। নায়েব মশাই বল্লেন যে, এই মাসের মধ্যে যদি বেবাক টাকা চুকাইয়া না দেওয়া হয়, তা হ'লে সমস্ত জমি তাঁরা অন্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। কৈ, এত বাকীর কথা ত তুমি একদিনও আমাকে বল নাই ?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "সে কি কথা! আমি ত কিছুই জানি না। খাজনা যে এতদিনের বাকী আছে, কি ক'রে জানব!"

জমির বলিল, "সাধু সর্দ্দারকে সকলেই ভালবাসত, নায়েব মশাইয়ের সঙ্গেও তার খুব দহরম মহরম ছিল; তাই তাঁরা আর ও সম্বন্ধে তাগাদা করেন নাই, সাধুও সে কথা ভাবে নাই। এখন মহা বিপদ্! আমি এত টাকা কোথায় পাব ? এখন কি করা যায়, তাই বল ?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি বল্‌ব; যাতে ভাল হয়, তাই কর। জমিটুকু গেলে ছোঁড়াটার কি হবে ?"

জমির বলিল, "আমার হাতে ত আর নশ' পঞ্চাশ নেই যে, তাই দিয়ে তোমাদের জমি বাঁচাই; আর সাধুও দুপয়সা রেখে যায় নি! এমন জান্‌লে আমি এ সব গোলের মধ্যেই যেতাম না। পরের বালাই ঘাড়ে ক'রে এখন আমি বাড়ী আর কাছারী করি।"

এই কথার আর উত্তর নাই; অলিমদ্দীর মাতা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার কোন কথাই বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু সে স্ত্রীলোক; এ বিপদে যে কি করিতে হইবে, কাহার আশ্রয় লইতে

হইবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। এ দিকে জমির জমিদারের নায়েবের সহিত যোগ দিয়া সাধুর সমস্ত জমি নিজের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইল। অলিমদ্দীর মাতা যখন এই কথা শুনিল, তখন সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইল।

জমিরের ব্যবহার ক্রমেই কঠোর হইতে লাগিল। অলিমদ্দীর উপরই তাহার রাগ বেশী হইল; কিন্তু এ রাগের কারণ কি, তাহা কেহই খুঁজিয়া পাইল না। বেগতিক দেখিয়া অলির মাতা পুত্রকে মণ্ডলদের বাড়ীর রাখালীতে নিযুক্ত করিয়া দিল; কিন্তু সে সেখানে অনেক দিন থাকিতে পারিল না; একটা ছাগল হারাইয়া যাওয়ায় মণ্ডলেরা অলিকে বিদায় করিয়া দিল।

এই গল্পের আরম্ভেই মাতা ও পুত্রের যে দিনের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে, সেই দিন প্রাতঃকালে জমিরের মেজাজ্‌টা কি জানি কেন বড়ই খারাপ হইয়াছিল। প্রথমে সে এটা ওটা বলিয়া স্ত্রীর উপর যথেষ্ট বাক্য-বাণ বর্ষণ করিল; কিন্তু জমিরের স্ত্রী বড়ই ভালমানুষ; সে একটি কথারও উত্তর দিল না। কথার উত্তর না পাইলে কোন দিনই ঝগড়া বা কথা জমে না; এ ক্ষেত্রেও তাই হইল; জমিরের সকল দুর্ব্বাক্যই ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহার স্ত্রী কোন কথারই প্রতিবাদ করিল না।

জমির তখন স্ত্রীকে ছাড়িয়া তাহার পুত্রের উপর গালি বর্ষণ আরম্ভ করিল; বলিল, "দেখ দেখি, এত বড় ছেলেটা, কাজকর্ম্ম কিছুই কর্‌বে না; শুধু ব'সে ব'সে গিল্‌বে। কেন, আমি কি ওর সাতপুরুষের দেন্‌দার। ও আমার কে যে, আমি ওকে এমন করে খেতে দেব? কথা কও না যে?"

রমণী সমস্তই সহ্য করিতে পারে; সকল নির্য্যাতন, সকল অপমান সে মাথা পাতিয়া লইতে পারে; শুধু পারে না দুইটি কথা; একটি তাহার

সতীত্বের উপর সন্দেহ, আর একটি পারে না তাহার পেটের সন্তানের উপর অবিচার। জমিরের স্ত্রীর উপর দিয়া এত কথা হইয়া গেল, তাহাতে সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না ; কিন্তু যখন তাহার একমাত্র পুত্রের উপর জমির অবিচার করিল, তখন তাহার মাতৃত্বের গর্ব্ব মাথা নীচু করিয়া থাকিতে পারিল না ; সে তবুও ধীরভাবে বলিল, "ও তোমার কেউ নয়, কিন্তু ও আমার পেটের ছেলে।" অভাগী আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। জমির আর কিছু না বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই অলিমদ্দী বাড়ী আসিয়া মায়ের নিকট ভাত চাহিলে তাহার মাতা অভিমানভরে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(৪)

হারু পরামাণিকের বাড়ী অলিমদ্দীর রাখালী কর্ম্ম হইল না। তাহারও কারণ জমির। জমির হারু পরামাণিককে বলিয়াছিল, "দেখ পরামাণিকের পো, অলিরে নিতে চাচ্ছ নেও ; কিন্তু শেষে একটা চুরী চামারী হ'লে আমাকে কিছু বল্‌তে পার্‌বে না ; সে কথা কিন্তু আগেই ব'লে রাখ্‌ছি।" এমন প্রশংসাবাদের পর কে কাহাকে কর্ম্ম দেয়?

অলিমদ্দী পরদিন যখন পরামাণিক বাড়ী গেল, তখন হারু পরামাণিক জমিরের কথা বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিল। অলিমদ্দী বিষণ্ণমুখে বাড়ী আসিয়া মাতাকে সমস্ত কথা বলিল। মাতা তখন পুত্রকে সাহস দিয়া বলিল, "ভয় কি! এক দুয়োর বন্ধ, দশ দুয়োর খোলা ; আল্লা দানাপানি ঠিক ক'রেই মানুষ পয়দা করেছেন। তুই ভাবিস্ নে ; যা হয় একটা হবেই।" মায়ের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া অলিমদ্দী মনে একটু বল পাইল ; বালক তখন সহাস্যবদনে চলিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় জমির বাড়ী আসিয়া যথারীতি আহারাদি শেষ করিয়া ঘরের বারান্দায় একখানি চট পাতিয়া বসিল, এবং এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিবার জন্য অলিমদ্দীকে ডাকিল। অলিমদ্দী তখন বাড়ীতে ছিল না। জমিরের স্ত্রী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "অলি ত বাড়ীতে নাই ; তোমার কি চাই ?"

জমির বলিল "বাড়ী নেই, কোথায় গেল ?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "ও পাড়ায় পীরের গান হবে, সে তাই শুনতে গিয়েছে।"

জমির তখন রাগিয়া বলিল, "নবাবজান গান শুন্‌তে গেছেন ! ঘরের কাজকর্ম্ম কর্‌লেও ত বুঝি যে, হাঁ একটা উপকার হয়।"

তাহার স্ত্রী ধীরভাবে বলিল, "ছেলেমানুষ, গান শুন্‌তে যেতে চাইল, আমিই তাকে যেতে বলেছি। তোমার তামাক সেজে দিতে হবে কি ?"

জমির কোন উত্তর করিল না ; তাহার স্ত্রী তখন কলিকা লইয়া রান্না-ঘরে গেল এবং তামাক সাজিয়া কলিকায় আগুন দিয়া জমিরের নিকট আসিয়া বলিল, "এই তামাক নেও।"

জমির তাহার স্ত্রীর হাত হইতে কলিকাটা টানিয়া লইয়া উঠানে ফেলিয়া দিল ; তাহার স্ত্রী অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; এ রাগের কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

স্ত্রীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জমির বলিল, "অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে !"

তাহার স্ত্রী বলিল, "তোমার এত রাগ কেন হ'ল, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি।"

জমির বলিল, "সে ভাবনাই যদি তোমাদের থাক্‌বে, তা হ'লে ত

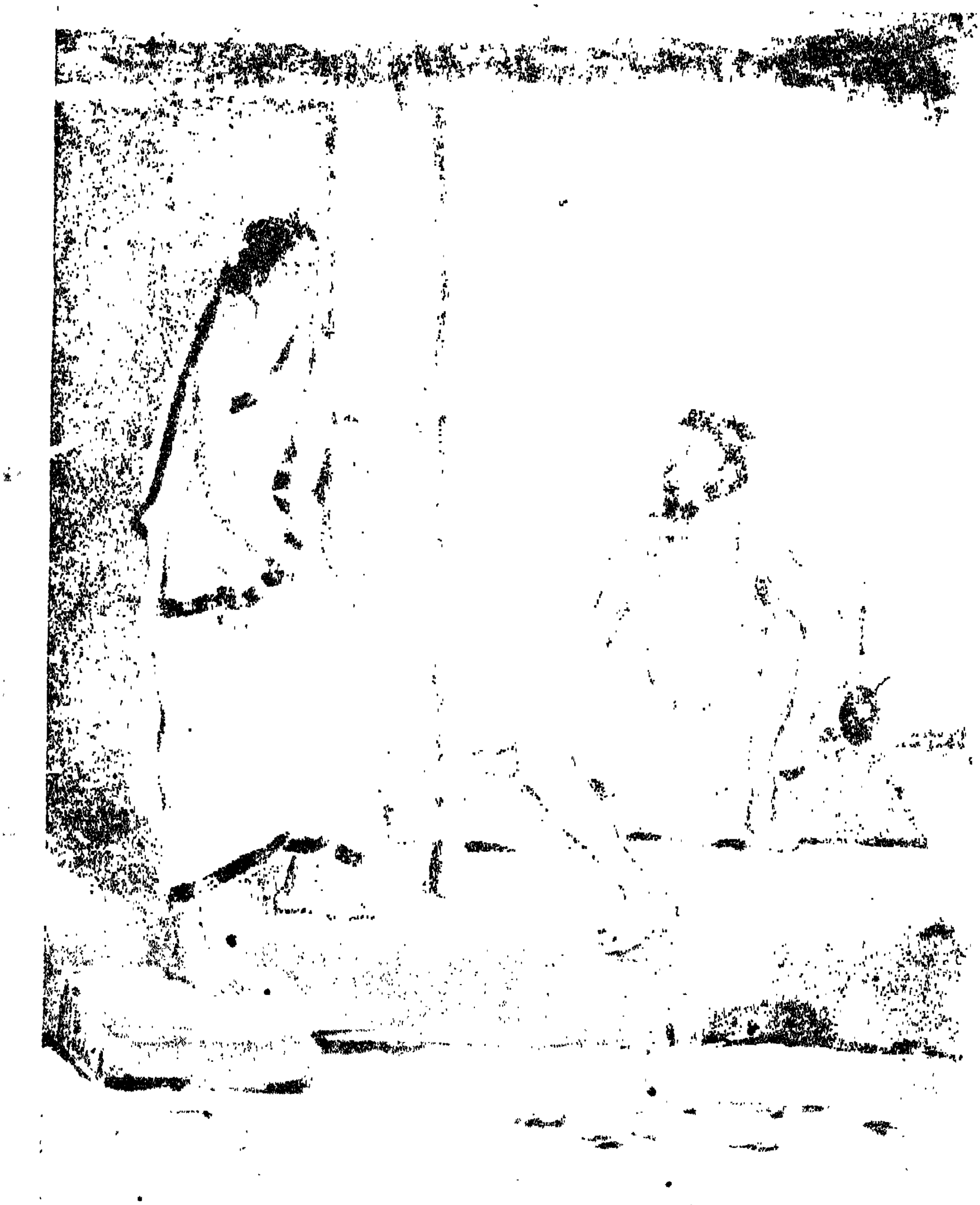

হ'তই। এই সারাদিন খেটেখুটে ঘরে এলাম, কোথায় একটু সোয়াস্তি করব, তা নয় এই সব।"

তাহার স্ত্রী বলিল, "এই সব কি তা' ত বুঝলাম না।" জমির তখন আরও রাগিয়া উঠিল, বলিল, "কি, মুখের উপর জবাব! এত বড় গোস্তাকি!"

জমিরের স্ত্রী আর কথা বলিল না, চুপ করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। কথা বলিলেও গোস্তাকি, চুপ করিয়া থাকিলেও গোস্তাকি! এ রকম বদ্‌মেজাজি লোকের সঙ্গে কে পারিয়া উঠে?

জমির বলিল, "চুপ ক'রে রইলে যে?" তাহার স্ত্রী কোন উত্তর করিল না। তখন জমির বলিল "হারু পরামাণিক ত তোমার ছেলেকে রাখ্‌বে না। অমন চোরের ব্যাটা চোরকে কে ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌বে?"

পুত্রের উপর এ অবিচার মায়ের প্রাণে বড়ই বাজিল; সে মনে করিয়াছিল কোন কথারই উত্তর দিবে না; কিন্তু যখন তাহাকে উত্তর দিতেই হইবে, তখন সে অতি ধীরস্বরে বলিল, "অলি কোন দিন/চুরী করে নাই।"

জমির গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "চুরী করে নাই—সাধুর বেটা সাধু। বেজম্মা ছেলে আবার কত ভাল হবে?" ক্রুদ্ধা সিংহী গর্জ্জিয়া উঠিল;—জমিরের স্ত্রী বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘাড় বাঁকাইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "কি বলিলে? খবরদার অমন কথা আর মুখে এন না, সাবধান ক'রে দিচ্ছি। কি ব'লব তোমাকে, আল্লার নাম নিয়ে নিকে করেছি, নইলে আর কেউ এ কথা বল্লে এতক্ষণ এই বাঁ-পায়ের লাথি দিয়ে তার মুখ ভেঙ্গে দিতাম।" জমিরের স্ত্রী আর সেখানে দাঁড়াইল না; দ্রুতগতিতে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। জমির হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার

সেই মূর্ত্তি দেখিয়া—সেই সতীত্বের গর্ব্ব, নারীত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া সে একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল; তাহার কথা বলিবার শক্তি অপহৃত হইয়াছিল।

বাহিরে তখন ঘোর অন্ধকার; আকাশে দুই দশটী তারা ফুটিয়া রহিয়াছে; সমস্ত গ্রামটা যেন ঝম্‌ঝম্‌ করিতেছে; নিকটের জঙ্গলের ঝিঁঝিঁ পোকার স্বর সেই ঘনান্ধকার রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। জমির বসিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার স্ত্রী কোথায় চলিয়া গেল? এই অন্ধকার রাত্রিতে বাড়ীর বাহির হইয়া সে ত পুকুরে আত্মহত্যা করিতে গেল না? তাহার মনে তখন ভয়ের সঞ্চার হইল। সে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই জমিরের স্ত্রী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। জমির তখন ধীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এই আঁধার রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলে?"

তাহার স্ত্রী সে কথার উত্তর দিল না। জমির মনে করিল তাহার স্ত্রী বোধ হয় প্রশ্নটা শুনিতে পায় নাই; তাই সে পুনরায় বলিল, "এমন আঁধার রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলে?"

তাহার স্ত্রী উত্তর করিল, "কোথাও যাই নাই; কোথায় যাব, তাই বাইরে গিয়ে গাছতলায় বসে ভাব্‌ছিলাম।"

জমির একটু সাহস পাইল; সে বলিল, "তবে এখনও রাগ যায় নাই?"

তাহার স্ত্রী ক্রুদ্ধ-স্বরে বলিল, "তুমি আজ যে কথা বলেছ, তাতে যে রাগ ক'র্‌বে না, তাকে আমি মেয়েমানুষই বলি না। শোন, তখন রাগ বেশী হয়েছিল, তাই কি বল্‌তে কি বল্‌ব মনে করে তোমার সুমুখ থেকে চ'লে গিয়েছিলাম। এখন আমার কথা শোন, তুমি আমাকে যে কথা বলেছ, তারপর আর তোমার ঘরে থাকা আমার চলে না। আমি

ছেলেটার হাত ধ'রে যে দিকে হয় চলে যাব। যে আল্লা আমাদের পয়দা করেছেন, তিনি আমাদের দুজনকে দুমুঠো খেতে দিতেও পার্‌বেন। তোমার দেওয়া দানা-পানি আর আমরা খাব না। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিই; কাঁচা ছেলের যা কিছু ছিল, তা এমন করে ঠকিয়ে নিয়ে তুমি ভোগ কর্‌তে পার্‌বে না —আল্লা আছেন, তুমি কিছুতেই পার্‌বে না—। আমি যদি সতী নারীর মেয়ে হই, আমি যদি সর্দ্দারের বউ হই, তা হলে তোমায় বলে যাচ্ছি, ছেলে মানুষের ঠকিয়ে নেওয়া বিষয় তোমার থাক্‌বে না—থাক্‌বে না। আরও শোন, যে মুখে তুমি আমার ছেলেকে বেজন্মা বলেছ, সেই মুখে যে কি হয়, তা দশজনে দেখ্‌বে, আমি আর সে কথা মুখে আন্‌ব না।"

স্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনিয়া জমির ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল; তাহার আর তখন কাণ্ডজ্ঞান থাকিল না। সে বাঘের মত এক লম্ফ দিয়া তাহার স্ত্রীর উপর পড়িল এবং "তবে রে হারামজাদি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা" বলিয়া সেই অসহায়া রমণীকে এক পদাঘাত করিল।

তাহার স্ত্রী তখন "হা আল্লা' বলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল; এবার আর সে কোন কথা বলিল না। জমির রাগে অধীর হইয়া বলিল "এখনই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা; নইলে তোর ভাল হবে না—তোকে কেটেই ফেল্‌ব।"

"আর বলিতে হইবে না; তোমার বাড়ীতে আর এক লহমাও থাকিব না। এর ফল তোমাকে ভুগ্‌তে হবে।"

এই বলিয়া জমিরের স্ত্রী জন্মের মত সেই বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে অলিমদ্দি বা তাহার মাতাকে কেহ আর সে গ্রামে দেখিতে পাইল না।

তাহার পর—তাহার পর—আর কি! সতীবাক্য কি কখন অন্যথা

হয়। একবৎসর যাইতে না যাইতেই জমিরের শরীরে কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সতী রমণীর কথা ফলিয়া গেল; সর্ব্বাগ্রে জমিরের মুখেই কুষ্ঠের ক্ষত দেখা দিল।”

তাহার পর— যাহা হইল তাহা আর শুনিয়া কাজ নাই।

"কোথায় আমরা যাই" !

পল্লীগ্রামে আমাদের বাস। গ্রামপ্রান্তবাহিনী নদীর জলে আমরা স্নান করি। নিজেদের ক্ষেতখামারের মোটা আউশের চাল, মটরের ডাল, বাগানের তরিতরকারী, গৃহপালিত গরুর দুগ্ধ আমাদের রাজভোগ। তৃণাচ্ছাদিত কুটীর আমাদের রাজপ্রাসাদ। বৎসরের বারমাস আমরা ম্যালেরিয়ায় ভুগি, কুইনাইন খাই, শরীর অস্থিচর্ম্মসার হয়; তাহার পর জীবনের হিসাবনিকাশ হইবার পূর্ব্বেই আমরা লোকান্তরে চলিয়া যাই। ইহাই আমাদের পল্লীজীবনের সুখ দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনী।

নানা কারণে, প্রধানতঃ দারিদ্র্যের তাড়নে, অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলি, বিলাসের আকর্ষণে এখন আর আমরা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" পরিয়া, মায়ের বাগানের শাক-সব্জী, কলার পাতায় সন্তুষ্ট নহি। তাই অর্থোপার্জ্জনের আশায় "টাকা সহর দিল্লী লাহোর মুর্শিদাবাদ কুচবিহার" ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। পল্লীগৃহের সহিত কাহারও বা যুগান্তে একবেলা দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমাদের গ্রাম পল্লীর সে সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন আমরা ভবঘুরে। এই ভবঘুরে-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমি অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় কলিকাতা প্রবাসী। এখন—

"নাই সে সরল কিশোর বয়স
সাঙ্গ সুখের খেলা।
আম্রবনে, সখার সনে
প্রাণের কথা বলা ;—

পথের বাঁকে, গাছের ফাঁকে,
শালিক, শ্যামা, দোয়েল ডাকে,
শালুক ফোটা বিলের বুকে
ভাসে কলার ভেলা।”

সে সকল অতীত স্মৃতি ধীরে ধীরে হৃদয় হইতে মুছিয়া যাইতেছে। এখন—

“যৌবনেতেই চুল পেকেছে
গালভরা সেই হাসি
এই দুনিয়ার মন্থনে হায়,
কোথায় গেছে ভাসি।
দাঁড়িয়ে কথা কবার মত—
আছে কি আর সময় তত—
কে কারে চায়? পান্থশালায়
রাত্রি-পরবাসী।”

তবুও কেমন মধ্যে মধ্যে সেই “পাখীডাকা ছায়ায় ঢাকা” পল্লীগৃহের কথা মনে হয়। তখন এই রাজধানীর অভ্রভেদী ইষ্টকস্তূপ সকল আর মায়াজাল বিস্তার করিতে পারে না। তখন এই কর্ম্মকোলাহল-মুখর রাজধানীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বন-জঙ্গলে, আদাড়-বাদাড়ে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই অবস্থায় এক রবিবার অপরাহ্ণকালে ট্রামের লম্বা টিকিট কিনিয়া একবারে টালীগঞ্জ ক্লাবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখান হইতে গ্রামের পথ ধরিয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত পদব্রজে আসিব, ইহাই স্থির করিয়াছিলাম। সে সময়ে আকাশের পশ্চিম কোণে ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ সঞ্চিত হইয়াছিল। মনে করিলাম এ মেঘ উঠিয়া আসিবে না,

অথবা উঠিয়া আসিতে যে সময় লাগিবে, ততক্ষণ আমি কালীঘাট পৌঁছিতে পারিব। এই মনে করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই সেই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বিস্তৃতায়তন হইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ট্রামপথ অনেক দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। আমি অনন্যোপায় হইয়া পথিপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইলাম ;—চাহিয়া দেখিলাম রাস্তার বাম পার্শ্বে একখানি কাঠকয়লার দোকান রহিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি সেই দোকানের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দোকানে তখন কোন ক্রেতা উপস্থিত ছিল না। দোকানদার ঝাঁপ বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল।

আমাকে দেখিয়া সেই দোকানদার বলিল, "মহাশয়, বারান্দায় জলের ঝাপ্‌টা লাগ্‌ছে ; আপনি ভিতরে এসে বসুন।" এই বলিয়া সে একটী কেরোসিনের বাক্‌স অগ্রসর করিয়া দিল। আমি বলিলাম "না থাক, আমি বেশ আছি, এখনই জল ছেড়ে যাবে।" দোকানদার বলিল "মেঘের যে রকম গতিক, তা'তে এখনই জল ছাড়বে না। আপনি ভিতরে এসেই বসুন। বাহিরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন। তামাক খান কি ?"

"না তামাক খাই না, চুরুট খাই—তা' আমার সঙ্গেই আছে।"—এই বলিয়া আমি সেই কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়া একটী চুরুট ধরাইলাম। বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

দোকানঘরখানি নিতান্ত ছোট নহে। চাহিয়া দেখিলাম, ঘরখানি দুই ভাগে বিভক্ত—সম্মুখভাগে দোকান, পশ্চাদ্ভাগে বোধ হয় দোকানদারের থাকিবার স্থান। দোকানের এক পার্শ্বে একখানি নাতিবৃহৎ চৌকি—তাহার উপর একটি মাদুর বিছান রহিয়াছে। সেই মাদুরের এক পার্শ্বে একটি কাঠের হাত-বাক্‌স এবং সেই বাক্সের পার্শ্বেই ৩৪ খানি

হিসাবের খাতা। চৌকীখানি যে দিকে দেওয়ালে সংলগ্ন, সেই দেওয়ালে দুইটি মুখ খোলা কেরোসিনের বাক্স আটকান আছে এবং সেই বাক্স দুইটির মধ্যে লম্বভাবে কয়েকখানি পুস্তক সজ্জিত রহিয়াছে। দোকানের অপর পার্শ্বের প্রায় অর্দ্ধাংশের উপর বাঁশদ্বারা বেষ্টিত। তাহারই মধ্যে কয়লার স্তূপ এবং তাহারই পার্শ্বে একরাশি জ্বালানী কাষ্ঠ রহিয়াছে। চৌকীর সম্মুখদিকে ৪।৫টি কেরোসিনের বাক্সের উপর কয়েকটি কেরোসিন তেলের টিন রহিয়াছে। পশ্চাদ্দিকের দেওয়ালের সম্মুখে ৮।১০টী বাক্স টিন বোঝাই রহিয়াছে। দোকানে অন্য কোন বিক্রেয় দ্রব্য দেখিলাম না—শুধু কাঠ কয়লা কেরোসিন তৈল।

অন্ধকার হইতেছে দেখিয়া দোকানদার চৌকীর নীচে হইতে একটি হারিকেন ল্যাম্প বাহির করিয়া জ্বালাইল এবং একখণ্ড চতুষ্কোণ তক্তা মাদুরের উপর রাখিয়া হারিকেনটী তাহার উপর বসাইল। তাহার পর আমাকে বলিল "আপনি এই চৌকীর উপরে উঠে বসুন। আকাশের যে গতিক দেখ্‌ছি, তাতে শীগ্‌গির জল ছাড়বার সম্ভাবনা নাই। আপনি কতদূরে যাবেন জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?" আমি বলিলাম, "কালীঘাটের নিকটেই আমার বাসা। আমি এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম; একটু জল ধরলেই এইটুকু চলে গিয়ে ট্রাম ধরে বাসায় যাব।" দোকানদার হাসিয়া বলিল, "আর যদি জল নাই ধরে।" আমি বলিলাম "দেখা যাউক।" দোকানদার যে ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, তাহাতে তাহাকে সামান্য মুদী বলিয়া আমার মনে হইল না। তাহার বয়সও অধিক নহে; খুব বেশী হইলে চব্বিশ পঁচিশ বৎসর। চেহারা দেখিলে ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া মনে হয়। তাহার পর দেওয়ালের গায়ে বাক্সের মধ্যে কতকগুলি বই দেখিয়া আমার মনে একটু সন্দেহও

হইয়াছিল। এতক্ষণ তাহাকে তুমি বা আপনি কি বলিয়া সম্বোধন করিব স্থির করিতে না পারিয়া এমন ভাবে কথা বলিয়াছি যাহাতে "তুমি বা আপনি" ব্যবহার করিতে না হয়। এইবার সে সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার এখানে কি কোন স্কুলের ছেলে থাকে?" দোকানদার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ঐ বইগুলি দেখে বোধ হয় আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন? ঐ বইগুলি আমার। পূর্ব্বের অভ্যাস ছাড়তে পারি নাই, তাই অবসর সময়ে সামান্য একটু আধটুকু পড়াশুনা করি"—এই বলিয়াই তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সামান্য ব্যাপারেই আমি এই দোকানদারটির সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝিয়া ফেলিলাম। বুঝিলাম ইনি ভদ্র গৃহস্থ-সন্তান, লেখাপড়া জানেন; অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সহরের প্রান্তদেশে এই কাঠ-কয়লা কেরোসিনের দোকান খুলিয়াছেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এখানে একাকী থাকেন?" তিনি বলিলেন "না, আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে থাকেন। এই পাশের ঘরেই আমরা স্ত্রী-পুরুষে বাস করি।" আমি বলিলাম "আপনার বাড়ী কোথায়, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া যুবকের মুখখানি কেমন মলিন হইয়া গেল। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এখন এই আমার বাড়ী।" আমি বুঝিতে পারিলাম যুবক আত্ম-পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। কাজেই আমি তাঁহার পরিচয় লাভের জন্য আর কোন প্রশ্নই করিলাম না। তিনি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অতি কাতর বচনে বলিলেন, "আমার মত হতভাগ্যের পরিচয় না জানাই ভাল। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখুন, আমি কায়স্থের সন্তান। আমার পরিচয় প্রদানের যে বাধা আছে, আপনার হয় ত সে বাধা না থাকিতে পারে।" আমি

তখন তাঁহাকে আমার নাম বলিলাম। তিনি হর্ষোৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার আর পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। আপনাকে আমি বিশেষভাবে জানি। আপনাকে দুই চারিবার আমাদের নর্ম্মাল স্কুলেই দেখিয়াছি। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগের শিক্ষক ছিলেন।" তাহার পর তিনি আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিলেন; সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তাহার পর তিনি অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি আমার গুরুস্থানীয়; যদি সাহস দেন তবে একটি প্রার্থনা জানাই।" আমি বলিলাম, "আপনি এমন ভাবে কথা বলিতেছেন কেন? আপনার যাহা বলিবার থাকে, স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন।" তিনি বলিলেন "আকাশের যে রকম অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতে আজ রাত্রিতে যে বৃষ্টি ছাড়ে এমন বোধ হয় না। যদি অনুমতি করেন, তা হ'লে আমার স্ত্রীকে আহারের আয়োজন কর্ত্তে বলি। আমিও কায়স্থ; তবে একটি কথা আপনাকে বলিয়া রাখা ভাল আমি সমাজচ্যুত, অথবা জাতিচ্যুতও বলিতে পারি।"

আমি বলিলাম "আমার আহারের জন্য ভাবতে হবে না। বৃষ্টি যদি নিতান্তই না ধরে, আপনি কি আমায় একটা ছাতা দিতে পারবেন না? আমি কালই ছাতাটা ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

তিনি বলিলেন, "এমন বৃষ্টির মধ্যে কি কেউ ঘরের বা'র হয়? আপনি বলেন কি?"—এই সময়ে পার্শ্বের কক্ষ হইতে সামান্য একটু শব্দ হইল। দোকানদার সেই শব্দ শুনিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন! একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রীও অনুরোধ করছেন যে, আপনি আজ এই গরীবের দোকানেই আতিথ্য স্বীকার করেন। আপনাকে খাওয়াতে পারি এমন কিছুই আমাদের ঘরে নাই; তবে এই ভয়ানক বৃষ্টির মধ্যে যাওয়া অপেক্ষা আমাদের দু'টো শাক ভাতই ভাল

মনে করেই এই অনুরোধ করছি। আর যাবেনই বা কি করে? এই বৃষ্টিতে ট্রাম নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গিয়েচে। এ অঞ্চলে ভাড়াগাড়িও কম; যে দুই চারিখানি আছে, তারাও বেরুবে কি না সন্দেহ। যদিই বা তা'রা ভাড়ায় যেতে স্বীকার করে, তা হলেও এই দুর্য্যোগের মধ্যে এখান থেকে কালীঘাট যেতে তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা চেয়ে বসবে। তবে যদি আমাদের হাতে খেতে আপনার আপত্তি থাকে, তা হলে জলখাবারেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

আমি বলিলাম "আপনি অত কথা বলছেন কেন? আমার সে সব আপত্তি কিছুই নেই। আর একটু অপেক্ষা করুন, ততক্ষণে জল যদি না ছাড়ে, তখন খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা যাবে। আপনার ঐ বাক্সে কি বই আছে দেখ্‌তে পারি কি?"

তিনি বলিলেন, "আপনার পড়বার মত কোনও বই নাই।"

আমি তখন একখানি একখানি করিয়া তাঁর বইগুলি টানিয়া বাহির করিতে লাগিলাম; দেখিলাম তাহার মধ্যে নাটক নভেল একখানিও নাই; আছে ভূদেববাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ," "পারিবারিক প্রবন্ধ," অক্ষয়-কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি,' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র,' হীরেন্দ্রবাবুর "গীতায় ঈশ্বরবাদ," আর কতকগুলি সংস্কৃত কাব্য ও নাটক। দেখিয়াই এই ভদ্র যুবকের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, কোন বিশেষ কারণে এই যুবক সমাজচ্যুত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি বইগুলি যখন যথাস্থানে রাখিতে আরম্ভ করিলাম, তখন যুবক বলিলেন "অন্য ভাল বইয়ের খোঁজও পাই না, কিন্‌বারও সাধ্য হয় না। ঐ কয়খানি বই-ই উল্টে পাল্‌টে পড়ি।"

বই সাজান শেষ হইলে আমি যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলাম,

"আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি না—কিন্তু আপনাকে কি নামে সম্বোধন করিব, তাহা ত জানা উচিত।"

তিনি বলিলেন "আমার নাম আপনার নিকট বলিতে কোনই আপত্তি নাই। আমার নাম—শ্রীঅতুলচন্দ্র কর। ইহা আমার ছদ্মনাম নহে—প্রকৃত নাম। আপনাকে পূর্ব্বেই ত বলেছি আমি সমাজচ্যুত বা জাতিচ্যুত ; এ অবস্থায় আমার অন্য পরিচয় গোপন রাখা কি সঙ্গত নয় ? যে কাহিনীতে কোন ভদ্র পরিবারের মান-সম্ভ্রম কলঙ্কিত হইতে পারে, তাহা গোপন রাখাই বোধ হয় কর্ত্তব্য।" এই কথা কয়টি বলিতে যুবকের যে অত্যন্ত কষ্ট হইল, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম।

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, আপনি পূর্ব্ব কথা তুলিবেন না। আমি তাহা জানিবার জন্য উৎসুক নই। আপনার সরলতা, আপনার ভদ্রতা এবং আপনার সদ্ব্যবহারই আপনার যথেষ্ট পরিচয়। আপনার সহিত এই একটু আলাপেই আমি আপনাকে চিনিয়াছি। আপনি সমাজচ্যুত হইতে পারেন, জাতিচ্যুত হইতে পারেন, কিন্তু আপনি মহত্ত্বচ্যুত নহেন। একজন যুবকের পক্ষে জীবনপথে ইহাই আমি সর্ব্বোচ্চ পাথেয় বলিয়া মনে করি। আমি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ ; বিশেষ আপনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ছাত্র ছিলেন ; আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি। আশীর্ব্বাদ করি—আপনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া সুখী হউন।"

আমার এই কথা শুনিয়া যুবক তাড়াতাড়ি আমার পদধূলি গ্রহণ করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "ও কি করেন!" যুবক আমার পদধূলি লইতে পারিলেন না।

সেই সময়ে বৃষ্টিও থামিয়া গেল। আমি বলিলাম "এখন আর জল

পড়ছে না, আমি আজ আসি। আর একদিন এসে আপনার এখানে খাওয়া দাওয়া কর্‌ব।”

তিনি বলিলেন, “এই বৃষ্টি থেমেছে, হয় ত আবার এখনই আসবে। আজ থেকে গেলেই ভাল হত। তা আপনি যখন নিতান্তই যেতে চাচ্ছেন, তখন আর আপনাকে বাধা দেব না। চলুন, আপনার সঙ্গে আমিও ট্রামের রাস্তা পর্য্যন্ত যাই। যদি ট্রাম না চলে তা'হলে কিন্তু ফিরে আসতে হবে।”

আমি বলিলাম—“সে কথা আর ব'লে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? এতখানি রাস্তা আর আমি হেঁটে যাচ্ছি না।”

এই সময় কক্ষান্তর হইতে আবার একটু শব্দ হইল। অতুলবাবু বলিলেন,—“আপনি একটু দাঁড়ান, আমি শুনে আসি।” এই বলিয়া তিনি ভিতরের কক্ষে চলিয়া গেলেন এবং এক মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—“আপনি আজ যদিই যান, তবে আবার কবে এসে এখানে খাওয়া দাওয়া করবেন, সেই কথাটা আমার স্ত্রী আপনার মুখ থেকে শুন্‌তে চাচ্ছেন।”

আমি হাসিয়া বলিলাম—“আজ রবিবার; বেশ, আসছে রবিবার সকালে উঠে এখানে আসব; এখানে স্নানাহার করে সারাদিন থেকে সন্ধ্যাবেলায় যাব।”

আবার শব্দ হইল। অতুল বাবু হাসিয়া বলিলেন—“বোধ হয় আপনার কথার প্রত্যুত্তর আস্‌ছে।” এই বলিয়া তিনি ভিতরে যাইতে উদ্যত হইলেন। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম “বারবার যাওয়া আসা করার অপেক্ষা আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে মধ্যবর্ত্তিতা করুন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে জবাব দিই।”

তিনি তখন দ্বারের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন—“ইনি বলছেন রবিবার আস্‌তে সাতদিন দেরী।”

আমি বলিলাম—"এ সপ্তাহের মধ্যে ত ছুটি নাই ; তবে যদি বলেন তা'হলে যে কোন দিন পাঁচটার পরে আসতে পারি।" অতুলবাবুর মারফৎ উত্তর আসিল—"তা, তা কাজ নেই, তবে রবিবারই আসবেন। আমাদের গরীব বলে ভুলে যাবেন না।" আমি বলিলাম "আমিও বড় গরীব।"

তখন অতুলবাবুর মুখে উত্তর আসিল,—"রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের বাড়ীতেও গিয়াছিলেন, এই যা আমাদের ভরসা। তা'হলে রবিবারই ঠিক রহিল।"

"বিশেষ কোনও প্রতিবন্ধক না হ'লে নিশ্চয়ই আস্‌ব"—এই কথা বলিয়া আমি দোকানের বাহিরে আসিলাম। অতুলবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

নানা বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে আমরা টালীগঞ্জের ট্রামের রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে তখন একখানি ট্রাম আসিতেছিল এবং আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই স্থানের পার্শ্বেই তারস্তম্ভের গাত্রে কাষ্ঠফলকে লিখিত ছিল "Cars stop here if required". অতুলবাবু গাড়ী আসিতে দেখিয়াই দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া 'বাঁধো, বাঁধো' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গাড়ী থামিল—আমি গাড়ীতে উঠিলাম। অতুলবাবু করযোড়ে, নতমস্তকে আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন "ভুলিবেন না—রবিবার সকালে—।" গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি মুখ বাড়াইয়া বলিলাম "নিশ্চয়ই।"

ট্রামে বসিয়া একটি কথাই বারবার আমার মনে উঠিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম যে, এমন সদালাপী সহৃদয় ব্যক্তি এমন কি অপরাধ করিতে পারেন, যাহাতে তিনি সমাজচ্যুত হইয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া, যুবতী স্ত্রী সঙ্গে লইয়া এই নির্ব্বান্ধব স্থানে নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে আসিয়াছেন। আমাদের সমাজে এখন ত কিছুতেই কাহারও

জাতিচ্যুতি ঘটে না; আমাদের সমাজ ত অনেক ধর্ম্মবিগর্হিত আচার-ব্যবহার অনায়াসে হজম করিয়া লইয়াছেন। বোধ হয় কোন পারিবারিক কলঙ্ক এই ভদ্রলোককে দেশত্যাগী করাইয়াছে। নানা কথা মনে হইল, নানা কারণ কল্পনা করিলাম, কিন্তু তাহার কোন একটার উপরও আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। এ কৌতূহল নিবৃত্তিরও কোন উপায় নাই। পরে যে দিন সাক্ষাৎ হইবে, সেদিনও তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না; অথচ এ চিন্তা ত্যাগও করিতে পারিতেছি না। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এই দিনের ঘটনার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার তেমন আবশ্যকতা অনুভব করিলাম না। এই দিনের পর হইতে পরবর্ত্তী শনিবার পর্য্যন্ত এমন দিন যায় নাই, যেদিন এই যুবকদম্পতির কথা আমার মনে হয় নাই।

রবিবার প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি স্নানাদি শেষ করিয়া টালীগঞ্জ যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ব শনিবার যে রাস্তার মোড়ে ট্রামে উঠিয়াছিলাম, দূর হইতে দেখিলাম সেই স্থানে একটি যুবক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অতদূর হইতে মানুষটিকে চিনিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু কি জানি কেন, আমার মনে হইল অতুলবাবুই ঐ স্থানে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। গাড়ী আর একটু অগ্রসর হইলে চাহিয়া দেখিলাম, অতুলবাবুই বটে!

বেলা তখন নয়টা। অতুলবাবু হয় ত মনে করিয়াছিলেন আমি সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই তাঁহার দোকানে পৌঁছিব। আমার বিলম্ব দেখিয়া, অথবা আমি হয়ত রাস্তা ঠিক করিতে না পারি—এই ভাবিয়া তিনি ট্রামের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

গাড়ীখানি সেই রাস্তার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র আমি নামিয়া পড়িলাম। অতুলবাবু অগ্রসর হইয়া, আমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে আসিলেন। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন

করিয়া বলিলাম "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ?" অতুলবাবু বলিলেন "আটটা পর্য্যন্তও যখন আপনাকে দেখলাম না, তখন আমি মনে করলাম, আপনি হয় ত আসিলেন না ; কিন্তু আমার স্ত্রী বলিলেন, তাহা হইতেই পারে না ; আপনি নিশ্চয়ই আসিবেন। তিনি বলিলেন—আপনি সেদিন ঝড়বৃষ্টির অন্ধকারে এসেছিলেন ; হয় ত রাস্তা ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছেন না। তাই তিনিই আমাকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বলে দিলেন।"

আমি বলিলাম, "ভারি পাগল দেখছি ত ! এই রাস্তাটাই চিনে নিতে পার্‌ব না ! তা যাক, আপনি কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্ম্মভোগ কচ্ছেন।"

অতুলবাবু একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "আধ ঘণ্টার উপর।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনারা দুইজনেই দেখ্‌ছি ছেলেমানুষ। তা চলুন, এখন যাওয়া যাক।"

অতুলবাবুর দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখি, দোকানের পার্শ্বের একটি বৃক্ষতলে হস্ত মুখ প্রক্ষালনের এবং স্নানের জল প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। দোকানের মধ্যের সেই তক্তপোষের উপর সেদিন আর শুধু মাদুর বিস্তৃত নাই ; তক্তপোষখানি একখানি ধব্‌ধবে বিছানার চাদরে আচ্ছাদিত হইয়াছে ; একটি বালিশ সেখানে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। একখানি পাটকরা কাপড় এবং একখানি নূতন তোয়ালে তক্তপোষের এক পার্শ্বে সুরক্ষিত হইয়াছে।

এই সকল আয়োজন দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম "সব কাজ ফেলে আজ বুঝি আমার অভ্যর্থনার জন্যই আপনারা ব্যস্ত হয়েছিলেন। এ সকলের কি দরকার ছিল ?"—এই বলিয়া আমি দোকানের এক পার্শ্ব হইতে একটি কেরোসিনের বাক্স টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িলাম।

অতুলবাবু বলিলেন, "ও কি বসা হল। আপনি তক্তপোষের উপর উঠে ভাল হয়ে বসুন।"

আমি বলিলাম, "সে ভাবনা আপনার করতে হবে না, আপনি আপনার কাজে যান। বাড়ীর ভিতর খবর দিন যে আমি এসেছি।"

অতুলবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এ ত আমার রাজ অন্তঃপুর নয় যে, খবর দিতে হবে! আপনি রাস্তায় থাকতেই সে খবর হয়ে গেছে।"

আমি বলিলাম, "তা'হলে বলুন আপনি মোড়ের মাথায়, আর আপনার স্ত্রী অর্দ্ধেক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার জন্য এত আকুল-ভাবে প্রতীক্ষা করবার কোন প্রয়োজন ছিল না! একদিনের সামান্য একটু পরিচয়ে মানুষ মানুষের জন্য যে, এত অধীর হয়—তা এত বয়স পর্য্যন্তও আমি জানতুম না।"

অতুল বাবু একটি সুন্দর উত্তর করিলেন; এমন কথা বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। তিনি বলিলেন "বিশ বছরের জানা শুনাতেও পরিচয় হয় না, আর বিশ মিনিটের পরিচয়েও আপনার জন পাওয়া যায়। চুম্বকেই লৌহ আকর্ষণ করে। লোহার কাছে লোহা পড়ে থাকলে দশ বিশ বছরও লাগে না, দশদিনেই তা মরচে ধ'রে যায়। সে সব কথা যাক, আপনি এখন কাপড় চোপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে স্নান করুন। বেলা কম হয়নি, ন'টা বেজে গিয়েছে।"

আমি বলিলাম, "সে সব কাজ সেরে আসতেই ত একটু দেরী হয়ে গিয়েছে!"—এই বলিয়া আমি পকেটে হাত দিলাম।

অতুলবাবু আমার ভাব বুঝিতে পারিয়াই বলিলেন, "আপনি চুরুট বার কচ্ছেন কেন? আমি যে আপনার জন্যে চুরুট এনে রেখেছি।"—এই বলিয়া তিনি পার্শ্বের একখানি তক্তার উপর হইতে ছয়টি চুরুট ও একটি দিয়াশলাই আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি যে এই দা-কাটা চুরুট খাই, এ আপনি জানলেন কি করে ?"

অতুলবাবু বলিলেন, "এই চুরুট কেনা নিয়ে আমাকে একটু বিব্রত হ'তে হয়েছিল। কা'ল বিকালে আমি যখন বাজার করতে যাই, তখন আমার স্ত্রী বলে দিয়েছিলেন যে, আপনি তামাক খান না, আপনার জন্য যেন চুরুট আনা হয়। আমি টালীগঞ্জের বাজার থেকে ভাল চুরুট যা পাওয়া যায়, তাই ছ'টা কিনে এনেছিলুম। আমার স্ত্রী সেই চুরুট দেখে বল্‌লেন, এ চুরুটে হবে না। আপনি যে চুরুট খান তাই আন্‌তে হবে। আমি ত ভেবে অস্থির। আপনি কি চুরুট খান, তা আমি কি ক'রে বুঝব। তিনি বল্লেন, বাজারে যত রকম চুরুট পাওয়া যায়, সব একটা একটা ক'রে নিয়ে এস, আমি দেখিয়ে দেব। কি করি মশায়, তখনই আবার বাজারে গেলুম। সব রকম চুরুট একটি একটি ক'রে নিয়ে এলুম। আমার স্ত্রী তার মধ্য থেকে এই রকমের চুরুট দেখিয়ে বল্লেন, আমি দেখেছি, তিনি ঠিক এই রকমের চুরুট খান। তুমি বাজারে গিয়ে আর গুলো ফিরিয়ে দিয়ে এই রকমের চুরুট নিয়ে এস। এই রকমে তিনবার হাঁটাহাটি করে এই চুরুট নিয়ে এসেছি। আপনি কি এই চুরুট খান ?"

আমি ইহার উত্তর কি দিব ? এই কথা শুনিয়াই আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। এমন আতিথ্য আমি জীবনে কখনও গ্রহণ করি নাই। সেই রাত্রিতে বসিয়া আমি কি চুরুট খাইয়াছিলাম, তাহা পর্য্যন্তও যিনি দেখিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে কি বলিব, তাহার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। এত আনন্দ বোধ হয় আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। আমার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। আমি ঐ সামান্য কয়েকটি চুরুটের মধ্যে রমণী-হৃদয়ের স্নেহ বাৎসল্য-ভক্তি বিমণ্ডিত দেখিলাম। সত্যসত্যই এ অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে

সম্পূর্ণ নূতন। আমার মনে তখন যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া আমি ধীরভাবে বলিলাম্ —"বেশ!" অতুলবাবু আর কোন কথা না বলিয়া চুরুট ও দিয়াশলাই তক্তপোষের উপর রাখিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া বসিয়া এই অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

একটু পরেই অতুলবাবু আসিয়া বলিলেন, "আপনাকে এই পাশের ঘরে একবার যেতে হবে।"

আমি বলিলাম, "কেন—জলখাবারের জন্য না কি? সে সব কিছু দরকার হবে না, একেবারেই ভাত খাওয়া যাবে; আমার ওসব অভ্যাস নাই।"

অতুলবাবু বলিলেন, "জল ত একটু খেতেই হবে। রান্নার বিলম্ব আছে। আমাদের ত আর চাকর বামুন নেই। একটি মাত্র বুড়ো ঝি আছে। সেই দিনরাত থাকে, আর যতটুকু পারে কাজ কর্ম্মের সাহায্য করে। এখন আপনাকে জল খাবার জন্য ডাক্‌ছি না, তারও দেরী আছে।"

আমি মনে করিলাম বোধ হয় ভিতরের ঘরদুয়ারগুলি দেখাইবার জন্য তিনি আমাকে ডাকিতেছেন। তাই আমি বলিলাম, "আপনার দোকানঘর ত সেদিনই দেখেছি, আজও দেখলাম; চলুন আপনার ভিতরের ঘরদুয়ার ও গৃহস্থালী দেখে আসি।"

আমার কথা শুনিয়া অতুলবাবু অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "ভিতরে ঘর দুয়ার কিছুই নেই,—একখানি মাত্র রান্নাঘর, আর খানিকটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা। আর গৃহস্থালীর কথা যা বলছেন, তা বহুদূরে ফেলে এসেছি।" এই বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আমি সত্যসত্যই বড় বিপদে পড়িলাম। কোন্ কথা বলিলে তাঁহার

হৃদয়ে আঘাত লাগে, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে পারি না। তখনই মনে মনে স্থির করিলাম, এই যুবকের সহিত বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিতে হইবে। ঘর গৃহস্থালী, সংসার সমাজ, এ সকল সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিব না। তাহা হইলেই হয় ত যুবকের হৃদয়ে কি জানি কি পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে পারে।

অতুলবাবুর সহিত পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্রই অবগুণ্ঠনবতী একটি যুবতী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলেন। এ প্রণামে বাধা দিবার শক্তি আমার ছিল না। আমার শুধুই মনে হইল, যে যুবতী আমাকে প্রণাম করিতেছেন, তাঁহার পদধূলি পাইলেই আমি কৃতার্থ হইয়া যাই। আমি মনে মনে ঐ প্রণাম তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিলাম। কিছু বলিতে হয় তাই বলিলাম, "মা, তোমায় দেখিও নাই,—তোমাকে জানিও না,—তবে তোমাকে চিনিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি স্বামীসুখে সুখী হও। ইহার অধিক আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।" আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না। তখন আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা গোপন করিবার জন্য আমি অতুলবাবুকে বলিলাম, "চলুন অতুলবাবু, আপনার রান্নাঘর দেখি। মা অন্নপূর্ণা কি করছেন তার খবর নিয়ে আসি।"

অতুলবাবুর স্ত্রী পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা ভিতর দিকের উঠানে গেলাম। দেখিলাম ছোট একখানি রান্নাঘর এক পার্শ্বে আছে, রান্নাঘরখানি দুইভাগে বিভক্ত—একভাগে রান্না হয়, আর একভাগে বোধ হয় ঝি থাকে। ছোট উঠানটির দুইদিক বেড়া দিয়া ঘেরা, আর একদিকে রান্নাঘর, অপর দিকে দোকানঘর। অনেক গৃহস্থের বাড়ীর উঠান দেখিয়াছি, অনেক দেবালয়ের প্রাঙ্গণ দেখিয়াছি; কিন্তু এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য উঠান কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে ত পড়ে না। ক্ষুদ্র উঠানটি যেন পুষ্পবাটিকা, যেন

একটি কবিকুঞ্জ—না না যেন একটি তাপসের আশ্রম। কবি নহি, ভাবুক নহি, সাধু নহি, ধার্ম্মিক নহি, তপস্বী নহি,—এ উঠানের শোভা বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এই যুবক-যুবতীকে চিনিতে আর বাকী রহিল না। টালীগঞ্জের প্রান্তভাগে জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীর মধ্যে যে যুবক যুবতী এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, এত সৌন্দর্য্য, এত পবিত্রতা ঢালিয়া দিতে পারে, তাহারা মানব-মানবী, না দেব-দেবী!

আমি অতুলবাবুকে বলিলাম, "আপনার এখানে আসিয়া আমি পবিত্রতার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম।" অতুলবাবু মস্তক অবনত করিলেন। আমি তখন বলিলাম "চলুন বাহিরে যাওয়া যাক্; এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে রান্নার আরও দেরী হবে"—এই বলিয়া আমরা বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

তাহার পর জলযোগ—তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই আহার। কিন্তু সে সকলে.. বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে, আমার এ ছোট গল্পের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে। এই দম্পতির যেটুকু পরিচয় দিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক-গণ জলযোগ ও আহারের বিস্তৃত বিবরণ কল্পনা করিয়া লইবেন। আহারান্তে আমি বিশ্রামাসন গ্রহণ করিলাম, অতুলবাবু আহার করিতে গেলেন।

দশ মিনিটের মধ্যেই আহারাদি কার্য্য শেষ করিয়া অতুলবাবু বাহিরে আসিলেন। আমার দিবানিদ্রার অভ্যাস নাই, আমি বসিয়া বসিয়া এক-খানি পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতেছিলাম। অতুলবাবু বলিলেন, "আমার খেতে বড় দেরী হয়ে গিয়েছে! আপনার এতক্ষণ একলা একলা বসে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল।"

আমি বলিলাম, "একলা একলা বসে কোনই কষ্ট হয়নি; কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি একরকম না খেয়েই যে উঠে এসেছেন—এই মনে করেই এখন কষ্ট হচ্ছে।"

অতুলবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি দোকানদার মানুষ—বিশেষ একলা মানুষ—আমাকে সব কাজই তাড়াতাড়ি করতে হয়। আমার কোন দিনই পাঁচ মিনিটের অধিক সময় খেতে লাগে না। আজ খেতে বসে, আপনার কথা হতে হতেই দেরী হ'য়ে গেল।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দোকানদার মানুষেরা ত দুপুর বেলা একটু ঘুমায়। আপনি এই বিছানায় একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিন।"

আবার ভুল করিলাম। আমার কথা শুনিয়া অতুলবাবু মলিনমুখে বলিলেন, "স্কুল ছেড়েই বছর তিনেক পণ্ডিতী চাকরী করেছি, দিবানিদ্রার অবকাশ পাই নাই! অদৃষ্ট বিপর্য্যয়ে মুদীখানার দোকান ক'রেও পূর্ব্বের অভ্যাস এখনও ভুলতে পারছিনে। আমার জীবনের গত ২৪ বৎসর যদি একেবারে মুছে ফেলবার মত কোন ঔষধ পেতাম, তা'হলে—" আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "গত চব্বিশ বৎসরের সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধই রাখ্‌তে চাইনে। গত শনিবার থেকে পরিচয় আরম্ভ হওয়াতেই আমি পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ।"

অতুলবাবু অতি ধীরভাবে বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমার জীবনের কষ্টযন্ত্রণার কথা পৃথিবীতে আর কা'রও কাছে প্রকাশ করব না; কিন্তু আজ আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌ব। আপনাকে সব কথা না বলে আমি পারছি না। আপনি আমাদের যে স্নেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছেন দুইদিনের সামান্য পরিচয়ে আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন, আমরা যে তার মোটেই উপযুক্ত নই, আমরা যে সমাজের কারও একটুমাত্রও কৃপালাভের অধিকারী নই, এ কথা আপনাকে না বলে থাক্‌তে পার্‌ছি না। আপনাকে সকল কথা বলবার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে ব'লে দিয়েছেন। যা বলব, তা আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের কাহিনী নয়—আমার স্ত্রীরই জীবনকথা—

তাঁরই কলঙ্ক-কাহিনী। আপনি তাঁকে মা বলেছেন। আপনার সেই মায়ের কলঙ্কিত, লাঞ্ছিত জীবনকাহিনী আপনার শুনতেই হচ্ছে। সব কথা শুনে আপনার বিচারে যা হয় তাই কর্‌বেন।”

অতুলবাবুর এই সূচনা শুনিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইল। আমি বলিলাম, “আমি তাঁকে মা বলেছি, সহস্র ধূলা কাদা মাখা হলেও তিনি আমার মা। মায়ের সুখদুঃখের কথা শুনবার অধিকার পুত্রের আছে; কিন্তু মায়ের দুর্ব্বলতার কথা, মায়ের কলঙ্কের কথা পুত্রের অশ্রাব্য। হাজার কলঙ্ক থাকুক, হাজার দুর্ব্বলতা থাকুক, মা নামেই সব ধুয়ে যায়, সব মুছে যায়, সব দূর হ’য়ে যায়। ভারতের পুরাণে ইতিহাসে একজন বই দুইজন পরশুরাম জন্মেনি—”

আমার কথায় বাধা দিয়া অতুলবাবু অতি কাতরস্বরে বলিলেন, “আপনি যাঁকে মা বলেছেন, তাঁরই আদেশে তাঁর কথা আপনাকে বলছি। আপনার শোনা দরকার, আপনার জানা প্রয়োজন।”

আমি বলিলাম, “কেন অতুলবাবু, আমাকে সব কথা বলতে চাচ্ছেন? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ত কোন প্রয়োজনই দেখছি না।”

অতুলবাবু বলিলেন, “আপনি প্রয়োজন না দেখতে পারেন, আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজন অনুভব করছি। আমাদের জীবনের কথাও বড় বেশী নয়! অল্প দুই চারিটি কথা বল্‌লেই আপনি সব বুঝতে পারবেন!”—এই বলিয়া তিনি, যে কাহিনী বলিয়াছিলেন, যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনি বলিলেন :—

“এই চব্বিশ-পরগণা জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আমাদের বাড়ী ছিল। বাড়ী এখনও আছে, কিন্তু সে বাড়ী আর আমার নয় বলিয়া ‘ছিল’ বলিলাম। আমার মাতাপিতা কেহই বর্ত্তমান নাই। বাড়ীতে আমার এক বড় ভাই

আছেন, তাঁহার ছেলে মেয়ে ৪।৫টি আছে। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এক বর্ষীয়সী বিধবা পত্নী আছেন। তাঁহার দুইটি কন্যা ; তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমার যে বড় ভাই এখন বাঁচিয়া আছেন, তিনি বিপত্নীক। দশবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয় ; তিনি আর বিবাহ করেন নাই। আমার ছোট আর ভাই নাই, আমিই সর্ব্বকনিষ্ঠ। গ্রামের নাম, পিতা বা ভ্রাতার নাম বলিবার আমার অধিকার নাই। তাঁহারা সমাজে বাস করেন, আমি সমাজচ্যুত ; তাঁহাদের পরিচয়ে আমার পরিচয় দিবার আর অধিকার নাই।

"আমাদের বৈষয়িক অবস্থা একরকম ভালই ছিল। আমাদের যে জমাজমি ছিল এবং এখনও আছে, তাহাতে ভদ্রলোকের মতনই আমাদের সংসার চলিয়া যায়। গ্রামের মধ্যে আমরা দশজনের একজনই ছিলাম। আমার পিতা কোন দিন চাকরী করেন নাই, আমার দাদাও কখন চাকরী করেন নাই, এখনও করেন না। তিনি জমাজমি দেখেন, খাজনাপত্র আদায় করেন, তেজারতিও করেন। মামলা মোকর্দ্দমা করিতে এবং মামলা মোকর্দ্দমায় সলা পরামর্শ দিতে তিনি আমাদের গ্রামের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিলেও হয়। বাঙ্গলাদেশে এমন গ্রাম নাই, যেখানে দলাদলি নাই ; আমাদের গ্রামেও দলাদলি আছে। একদলের প্রধান আমার বড়দাদা, আর একদলের প্রধান আমাদের দক্ষিণপাড়ার একটি লোক—তিনিও জাতিতে আমাদেরই কায়স্থ। এই দুই দলে বিবাদ বিসংবাদ, মামলা মোকর্দ্দমা সর্ব্বদাই চলিত।

"দাদা সামান্য লেখাপড়া জানেন। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়াই তিনি বিষয়কর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। নিজে ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, এই জন্য আমাকে তাঁহারা লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। আমি আমাদের দেশেরই একটি স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাস

করিয়া কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতে আসি। আমি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় আপনার ছোট ভাই আমাদের শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পূর্ব্বেই আমার পিতার মৃত্যু হয় এবং ছাত্রবৃত্তি পাশের পরই সতর বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ হয়।

"আমার চাকরী করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বাড়ী বসিয়া কি করিব? বৈষয়িক কার্য্য দাদাই দেখেন শোনেন। এই জন্য আমি আমাদের গ্রাম হইতে চারিক্রোশ দূরস্থিত এক গ্রামে মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিতি স্বীকার করি। প্রতি শনিবারে স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিতাম, আবার সোমবারে যাইয়া স্কুল করিতাম। এই পণ্ডিতি আমি তিন বৎসর করিয়াছি। তাহার পরই আমার দুর্দ্দশার আরম্ভ।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বড়দাদা একদলের প্রধান ছিলেন। মামলা মোকর্দ্দমা, ভিন্ন দলের লোকের অনিষ্টসাধন, তাহাদিগের নির্য্যাতন, এই সকল তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িল। এই জন্য আমাদের গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে তাঁহার শত্রুর সংখ্যা বড় কম ছিল না। কিন্তু কেহই তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না; সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত, কারণ তাঁহার অসাধ্য কোন কর্ম্মই ছিল না। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাই আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে এই সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিতাম। তিনি আমার সে অনুরোধ শুনিতেন না; বলিতেন—এই রকম শক্ত না হ'লে কি বিষয় রক্ষা করা যায়, না দশজনে মানে চেনে। আমি কি করিব, নীরব হইতাম।

"আর একটী কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমার দাদা বিপত্নীক ছিলেন। তিনি তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন নাই। আমাদের

গ্রামেই ভিন্ন দলের এক গৃহস্থের বাড়ীর একটি বিধবার সম্বন্ধে নানা কুৎসা শুনিতে পাওয়া যাইত। আমার দাদার নামও সেই কুৎসায় সংশ্লিষ্ট ছিল। এই কথা যখন আমার কর্ণগোচর হয়, তখন আমি বৌদিদিকে এ কথা বলি। তিনি বলেন 'কথাটা আমিও শুনিয়াছি। অনেকে অনেক কথা বলে; তার মধ্যে সত্য মিথ্যা আছে। আমি খোঁজ নিচ্ছি, তারপর যা হয় করা যাবে।' এই প্রৌঢ় বয়সে দাদার চরিত্রদোষ ঘটিলে যে বিষয় রক্ষা পাইবে না, এমন কি তাঁর প্রাণও যাইতে পারে, এই ভয়ই আমার প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু দাদার এই পাপের গুরুতর দণ্ড যে আমাকে ভোগ করিতে হইবে, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

"এক বুধবার প্রাতঃকালে আমি স্কুলঘরে বসিয়া একটি প্রাইভেট ছাত্রকে পড়াইতেছি, এমন সময়ে আমাদের চাকর হরিদাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে বলিল "ছোটবাবু, মেজবাবু আপনাকে এখনই বাড়ী যেতে বলেছেন।" আমার দাদাকে সকলেই মেজবাবু বলিয়া ডাকিত। আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলাম "কেন রে হরে? বাড়ীর সব ভাল ত?" হরিদাস ঢোক গিলিয়া বলিল, "এজ্ঞে বাড়ীর সকলের অসুখ বিসুখ হয় নাই।" আমি বলিলাম, "তবে এত তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন কেন? তুই যা, দাদাকে বলিস্ আমি স্কুলের ছুটীর পর যাব এখন।"

হরিদাস বলিল, "এজ্ঞে, মেজবাবু বলেছেন আপনাকে এখনই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।" আমি বলিলাম "কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নি ত?" হরিদাস বলিল, "এজ্ঞে না। আপনি শিগ্‌গির চলুন।"

আমি বলিলাম "তুই তা'হলে কিছুই জানিস্ নে!" হরিদাস সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "এজ্ঞে, আপনি চলুন, আর দেরী কর্ব্বেন না!"

আমি মনে করিলাম, বোধ হয় আজই কোন দলিল লেখাপড়া হইবে, তাই দাদা আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। হরিদাস হয় ত সে কথা জানে না। হরিদাসকে দেখিয়াই যে উৎকণ্ঠা বোধ হইয়াছিল, তাহা অনেকটা কমিয়া গেল। হরিদাসকে বলিলাম, "তুই একটু ব'স, আমি মাষ্টার মহাশয়কে ব'লে আসি।"

আমি তখনই হেডমাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গেলাম, এবং সেই দিনের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী যাত্রা করিলাম। হরিদাস বলিল "ছোট বাবু, আপনি আস্তে আস্তে আসুন, আমি এজ্ঞে আগে গিয়ে খবর দিই।" এই বলিয়া আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই হরিদাস চলিয়া গেল। বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা হইলে হরিদাস সে কথা নিশ্চয়ই বলিত, এই ভাবিয়া আমি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিলে রাস্তায় যে দুই চারিজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা আমাকে দেখিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল; শুধু কুবের মণ্ডল নামক একটি মুসলমান আমাকে সেলাম করিয়া বলিল "ছোটাবাবু, এই বুঝি আস্‌ছেন। যান, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ঘরে যান। হা আল্লা! এমন মানুষের উপরও এমন দুষমনি করে!"—এই বলিয়াই সে পার্শ্বের একটা গলিতে প্রবেশ করিল। তাহার কথা শুনিয়া আমার প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। তবে ত নিশ্চয়ই কোন বিপদ হইয়াছে! কুবেরকে ডাকিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিব, সে সাহসও হইল না। আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। বাড়ীতে যাইয়া কি বিপদের কথা শুনিব—ভাবিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমি আমাদের বাড়ীর সদরের বৈঠক-

খানার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। একটু দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলাম, বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় বসিয়া কতকগুলি লোক হাত মুখ নাড়িয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই তাহারা চুপ করিল। আমি কম্পিত হৃদয়ে প্রথমে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাদা কৈ রে?" বাহিরে যাহারা বসিয়া ছিল, তাহারা সকলেই আমাদের মুসলমান প্রজা। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "মেজবাবু বাড়ীতে নেই গো ছোট বাবু!" আমি বলিলাম "কোথায় গিয়েছেন?" কেহই এ প্রশ্নের উত্তর করিল না।

"সেই সময়ে বৌদিদি আলুথালু বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, সর্ব্বনাশ হয়েছে! জাতমান সব গিয়েছে!" তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, শুধু কাঁদিতে লাগিলেন। আমি অতি কাতরকণ্ঠে বলিলাম, "কি হয়েছে বৌদিদি, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।" বৌদিদি তখন আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বাড়ীর ভিতরে এস ঠাকুর পো, সবই শুন্‌তে পাবে।" আমি তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"আমাকে দেখিয়া বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন এবং প্রতিবেশিনীরা যে পাঁচ সাত জন উপস্থিত ছিলেন, সকলেই আমাকে বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একযোগে যে সকল কথা বলিলেন,-তাহার সার মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বরাত্রিতে দক্ষিণপাড়ার চারি পাঁচ জন লোক আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রীকে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। দাদা তখন বাড়ীতে ছিলেন না; চাকরেরাও কেহ বাড়ী ছিল না! বাড়ীর স্ত্রীলোকদের চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা অনেকেই দৌড়িয়া আসিয়া-

ছিল; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই দুর্বৃত্তেরা আমার স্ত্রীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। সমস্তরাত্রি পাড়ার সকলে মিলিয়া আমাদের গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী ৩।৪খানি গ্রামের ঘাটে মাঠে জঙ্গলে অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাদের খোঁজ পায় নাই। প্রাতঃকালে আমাদের গ্রামের পশ্চিমদিকের মাঠে এক শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে আমার স্ত্রীকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া দাদা তৎক্ষণাৎ পালকী বেহারা লইয়া আমার স্ত্রীকে সেই পাল্‌কীতে উঠাইয়া লইয়া থানায় চলিয়া গিয়াছেন।

"এই কথা শুনিয়া আমি দুই চক্ষুতে অন্ধকার দেখিলাম। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম, বড় বৌদিদি আমাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বসিলেন। তাহার পরই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

"আমার যখন জ্ঞানসঞ্চার হইল তখন দেখিলাম, আমার পার্শ্বে আমাদের গ্রামের ডাক্তারবাবু বসিয়া আছেন; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম গ্রামের আরও কয়েকজন লোক ঘরের মধ্যে বসিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। আমি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলাম—'দাদা!' দাদা ঘরের মধ্যেই ছিলেন। আমার আহ্বান শুনিয়া তিনি আমার বিছানার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাদার এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমি আর কখনও দেখি নাই। চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, মুখে ভয়ঙ্কর ক্রোধের চিহ্ন; তাঁহাকে দেখিয়া উন্মাদ বলিয়াই বোধ হইল। আমি ধীরে, ধীরে বলিলাম 'কোন সন্ধান পাওয়া গেল কি?' দাদা চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'দেখে নেব! তাদের ভিটে মাটী শ্মশান করে তবে আমি ছাড়ব। দারোগাবাবু এসে তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে থানায় গিয়েছে। যথাসর্ব্বস্ব যায়, তাও স্বীকার, তাদের দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।' দাদা রাগে ফুলিতে লাগিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম 'তারপর!' আমার প্রশ্ন

বুঝিয়া একজন প্রতিবেশী উত্তর করিল, 'বৌমার কথা জিজ্ঞাসা করছ ? পুলিস তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।' আমি আবার জ্ঞান হারাইলাম।" এই বলিয়া অতুলবাবু চুপ করিলেন ; আমিও এই লোমহর্ষণ কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। আমার কথা বলিবার শক্তি একেবারে অপহৃত হইয়াছিল। দুই জনেই চুপ করিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অতুলবাবু বলিলেন "আমার দুঃখের কথা শুনে আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি ; কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, আমি কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা, কি শক্তিশেলের আঘাত পেয়েছিলাম। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। অবশিষ্ট কয়েকটি কথা সংক্ষেপেই শেষ করব। তারপর প্রায় দুইমাস ধ'রে মোকর্দ্দমা চলল। তিন জন আসামী সেসন সোপর্দ্দ হ'ল। আমার অভাগী স্ত্রী কতকদিন হাসপাতালে, আর কতক দিনে পুলিসের জিম্মায় একটি ব্রাহ্মণ ইনেস্পেক্টরের বাসায় আশ্রয় পাইল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন দিন তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করি নাই। আদালতে যখনই তাহাকে দেখিতাম, তখনই তাহার মলিন মুখ, কাতর দৃষ্টি দেখিয়া আমি যে হৃদয়ে কি যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি, তাহা আপনি বুঝিতে পারেন। কত দিন ইচ্ছা হইয়াছে নিরপরাধা অভাগী দুঃখিনীকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করি। কিন্তু তাহা পারি নাই। বুক ফাটিয়া গিয়াছে, অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়াছি ; কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলি নাই—বলিতে পারি নাই। এতই দুর্ব্বল—এতই কাপুরুষ আমি তখন ছিলাম !

"তাহার পর বিচার শেষ হইবার দিনের কথা—। এ দিনের দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিব না। এ দিনের ঘটনা বলিব কি—ভাবিতেও আমার কষ্ট হয়। সেসনের বিচারে আসামী তিনজনের দশ বৎসর করিয়া

দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল। আমি এবং আর সকলে আদালত-গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিলাম। বেলা তখন প্রায় চারিটা। এই মোকর্দ্দমার রায়ের পরই জজ সাহেব উঠিয়া গেলেন—আদালতের কার্য্য শেষ হইল। আমরা সকলে বাহিরে আসিলাম। আমার স্ত্রীকেও সে দিন আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সেও বাহিরে আসিল। তাহার পর কি হইল, সে কথা আপনাকে কি করিয়া বলিব! সে দৃশ্যের বর্ণনা কেমন করিয়া দিব। দাদা, আমি, আমার খুড়শ্বশুর, আমার দুই শ্যালক এবং তিন চারিজন প্রতিবেশী সকলে আদালতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন দাদা বলিলেন, "চল, কালীঘাটে মাকে দর্শন করিয়া বাড়ী যাই।"

আমার স্ত্রী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল! অভাগী হয় ত জানিত না এই জনসমুদ্রে তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া, চিরনির্ব্বাসিতা করিয়া আমরা ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি। সে হয়ত মনে করিয়াছিল কেহ না কেহ এখনই তাহাকে ডাকিয়া লইবে! তাহার স্বামী, তাহার খুড়া, তাহার দাদা সকলেই উপস্থিত—এখনই তাহাদের মধ্যে কেহ তাহার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু কৈ, কেহই ত তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না, সকলেই চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

আমি তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না! এত দিন কত কথা শুনিয়াছি—কত হৃদয়বিদারক ব্যবস্থার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এক দিনও একটী কথার উত্তর করিবার শক্তি-সামর্থ্য আমার হয় নাই। সে দিন সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে আমি সেই অভাগীর দিকে চাহিলাম—দেখিলাম সেও কাতরনয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে। অবগুণ্ঠন সত্ত্বেও আমি সবই দেখিতে পাইলাম।

আমি তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "দাদা, এখন ওর কি হবে?"

দাদা আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তীব্র স্বরে বলিলেন "ওর আবার কি হবে! ওকে কি আর ঘরে নেওয়া যায়? পাজী বেটাদের দণ্ড হয়ে গেল, ও এখন যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাক্—ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।"

অভাগী দূরে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি শুনিল—তাহার তখন লজ্জা ভয় কোথায় চলিয়া গেল। সে দৌড়িয়া আসিয়া আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু-পূর্ণনয়নে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো, তুমি আমায় রক্ষে কর, আমায় ভাসিয়ে দিয়ে যেও না।"

এতদিন যে কথা ভাবিয়াছি, পাষণ্ড, কাপুরুষ আমি এতদিন যে কথার মীমাংসা করিতে পারি নাই, সে দিন এক মুহূর্ত্তেই ঐ সাধ্বী রমণীর স্পর্শে, ঐ নিরপরাধা পতিপ্রাণা যুবতীর অশ্রুবিন্দুতে, তাহার করুণ কাতর হৃদয়ভেদী প্রার্থনায় আমার সে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। আমি দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া গেলাম, আমি সঙ্কোচ লজ্জা ভয় ভুলিয়া গেলাম, ভূত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গেলাম, বর্ত্তমান আমার চক্ষুর সম্মুখে রহিল। চাহিয়া দেখিলাম আমার পদদ্বয় ধরিয়া রহিয়াছে—এক দেবীরূপিণী রমণী;—সে আমার স্ত্রী! যাহাকে আমি আমার জীবনের সঙ্গিনী করিয়াছিলাম, অগ্নি-সাক্ষী করিয়া যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—সেই যুবতী আমার পদতলে। চাহিয়া দেখিলাম তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সতীত্বের বিমল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে।

"আমি তখন দৃঢ়স্বরে দাদাকে বলিলাম, 'তোমাদের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ না থাকিতে পারে, কিন্তু এ আমার স্ত্রী, আমার রক্ষণীয়া। আমি ইহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই—সে দোষ আমার, না ইহার। কাহার অপরাধে কাহাকে দণ্ড দিতে চাও? যাও, তোমরা ঘরে চলিয়া যাও। আমি তোমা-

দিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি—সমাজ পরিত্যাগ করিতে পারি—সংসার পরিত্যাগ করিতে পারি, পথের ভিখারী হইতে পারি—কিন্তু আমার নিরপরাধা সতীসাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

"আমার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। আমার স্ত্রী ভূমিশয্যা ছাড়িয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার দাদা কুপিত স্বরে বলিলেন, 'কি করতে যাচ্ছিস ভেবে দেখেছিস? যা কেউ কখনও করেনি, কর্ত্তে পারেনি, আমি সমাজে বাস করে তোর মায়ায় তা কর্ত্তে পার্ব্ব না। এখনও ভেবে দেখ,এখনও বুঝে দেখ!'

"আমি বলিলাম, 'বেশী কথার কিছু প্রয়োজন নেই। ওকে পূর্ব্বের মত ঘরে স্থান দিতে পার, চল বাড়ী যাই— তা না পার, তোমাদের পথ তোমরা দেখ—আমাদের অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।'

"তবে তাই হোক, চল হে, সব চল'—ক্রুদ্ধস্বরে এই কথা বলিয়া আমার দাদা, আমার স্ত্রীর দুই সহোদর ভাই, তাহার খুড়া ও প্রতিবেশী কয়েকজন চলিয়া গেলেন।

"আমি তখন আমার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখি সে ভয়ে কাঁপিতেছে, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, 'ভয় কি, আমি তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি না।'

"আমার স্ত্রী অতি কাতরবচনে বলিল 'তুমি এ কি করিলে, আমার জন্য সব ছেড়ে দিলে! না—না—তুমি বাড়ী ফিরে যাও—ওগো তুমি বাড়ী ফিরে যাও—মা গঙ্গা আমাকে তাঁর কোলে স্থান দিবেন।'

অতুলবাবু আর কথা বলিতে পারিলেন না; তিনি দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তখন তক্তপোষ হইতে নামিয়া এই দেবহৃদয় যুবককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম—সত্য সত্যই আমার দেহ যেন পবিত্র হইয়া গেল।

একটু পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া অতুলবাবু বলিলেন, "তাহার পর আর কি। দেশে বিষয়-সম্পত্তিতে আমার যে অংশ ছিল, তাহা দাদার নিকট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহারই কিছু দিয়া এই স্থানে আসিয়া এই কাঠ-কয়লার দোকান খুলিয়াছি।"

অতুলবাবুকে কি বলিব,—পার্শ্বের কক্ষে উপবিষ্টা তাঁহার স্ত্রীকে কি বলিব? আমি কি বলিবার উপযুক্ত ব্যক্তি? আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

একটু পরেই অতুলবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উপদেশ দিন, আমরা এখন কোন্ সমাজের আশ্রয়ে দাঁড়াইব? হিন্দুসন্তান আমরা; **কোথায় এখন আমরা যাই?**"

আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। আজ হিন্দুসমাজপতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—তোমরা বলিয়া দাও—

ইহারা কোথায় যায়?

"জল—একটু জল—"

সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষার ফল রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হইলে দেখিলাম—অথবা ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, শুনিলাম—আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করিয়াছি। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মাতৃদেবী এবং বড়দিদি ঠাকুরাণী আনন্দিতা হইলেন। পিতৃদেব বিশেষ আনন্দ প্রকাশ না করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিলেন, "কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ অপরের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘ্য হইতে পারে, কিন্তু ৺রামকান্ত তর্কবাগীশের পৌত্র, জয়চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের পুত্রের ইহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই। কাব্য সকলেই অধিগত করিতে পারে। আগামী বর্ষে তুমি যদি স্মৃতির পরীক্ষায় সর্ব্বোত্তম স্থান অধিকার করিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব তুমি আমাদের বংশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।" আমার কিন্তু আর পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল না। পিতৃদেবের সম্মুখে কথাটা বলিবার সাহস পাইলাম না। সৌভাগ্যক্রমে আমার দিদি ঠাকুরাণী অন্য ভাবে সেই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা, হরচন্দ্রের আর পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই। তোমার কাছে যা স্মৃতি পড়েছে, তাতে তুমিই একটা উপাধি দিয়ে ওকে টোলে বসিয়ে দাও। বয়স্থা দেখে একটা মেয়ে এনে বিয়ে দিয়ে দাও—আমার মেয়েটারও একটা গতি কর—তার পর ওদের ঘর-গৃহস্থালীতে স্থিতি করে চল তুমি, আমি, আর মা কাশী চলে যাই।"

পিতৃদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যতগুলি কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ

আছে, তা সমস্তই তুমি বলে ফেল্লে মা—একটি কথা তুমি প্রণিধান কর নাই। ইদানীং আমাদের প্রদত্ত উপাধির আর তেমন সম্মান নাই। বাবাজীবন স্মৃতি শাস্ত্র যা অধ্যয়ন করেছেন, তা একজন পণ্ডিতের পক্ষে যথেষ্ট, তত্রাপি তাঁহার স্মৃতি-শাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন আছে। রাজকীয় উপাধি লাভ করিলে অধ্যাপকের গৌরব বৃদ্ধি হয়, চতুষ্পাঠিরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব মা, আর একটি বৎসর ধৈর্য্য ধারণ কর। বাবাজীবন স্মৃতির উপাধি লাভ করিলে, তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিব। আর তোমার কন্যার জন্য যদি উৎকৃষ্ট পাত্রের সংযোজন না হয়, তাহা হইলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকেই পুনরায় বরের আসন গ্রহণ করিতে হইবে।”

এই কথোপকথনের পর যখন এক বৎসর চলিয়া গেল, তখন আমি স্মৃতিশাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষা প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। মনে করিলাম এইবার নিশ্চিন্তমনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিব। মাথার উপর পিতা মাতা রহিয়াছেন, গৃহে মাতৃসমা বিধবা জ্যেষ্ঠা সহোদরা রহিয়াছেন, শিষ্য যজমান যথেষ্ট আছে, জমিজমাও নিতান্ত কম নাই; আর ভাই ভগিনীও নাই—আমার অভাব কি! পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সে সমস্তই আমার আছে। ভবিতব্য অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিলেন, “সব আছে!”

পরীক্ষার ফল বাহির হইবারও অবকাশ সহিল না—একদিন প্রাতঃকালে পিতৃদেব বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন, অপরাহ্ণ কালেই তাঁহার দেহাবসান হইল। সন্ধ্যার পরে তাঁহার পবিত্র দেহ শ্মশানে লইয়া গেলাম; রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে গৃহে ফিরিয়া দেখি মাতৃদেবীও উক্ত রোগাক্রান্তা হইয়াছেন। পূর্ব্বদিন যে সময়ে পিতৃদেব চক্ষু মুদ্রিত করেন, পরদিন ঠিক সেই সময়ে মাতৃদেবীও আমাদিগকে

পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তৎপরদিন অপরাহ্ণকালে ঠিক সেই সময়েই সংবাদ পাইলাম, আমি স্মৃতির পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছি। দিদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "এ সংবাদটা বাবা, মা শুনেও যেতে পারলেন না!"

পিতৃকার্য্য শেষ করিলাম। মহাসমারোহেই কার্য্য শেষ হইল। পিতার যেমন দেশজোড়া নাম ছিল, তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সেই ভাবেই সম্পন্ন করিতে হইল; তাহার জন্য আমাকে বিপন্ন বা ঋণগ্রস্ত হইতে হয় নাই; বর্দ্ধিষ্ণু শিষ্যগণই সে ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে আমি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইলাম। একদিন সন্ধ্যার পর দিদির সহিত গল্প করিতে করিতে বলিলাম, "দেখ দিদি, বাবার তিনটি ইচ্ছা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রথম—আমার বিবাহ। দ্বিতীয়—তোমার কন্যার বিবাহ। তৃতীয় তোমাকে কাশীধামে প্রেরণ। বাবা মা ত কাশীশ্বরের চরণে পৌঁছিয়াছেন, এখন তোমাকে কাশীতে পাঠাইতে পারিলেই হয়। তবে তার পূর্ব্বেই সুরমার বিবাহ কার্য্যটা শেষ করিতে হইবে।"

দিদি বলিলেন, "আর তোমার বিবাহ!"

অমি বলিলাম, "এত বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের কন্যা হইয়া তুমি এমন অশাস্ত্রীয় কথাটা বলিলে দিদি! এটি যে আমার মহাগুরু নিপাতের বৎসর। এই কালাশৌচের মধ্যে অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু পুত্র যে কখনও অরক্ষণীয় হয় এবং কালাশৌচের মধ্যে তাহার বিবাহ হইতে পারে, স্মৃতিশাস্ত্রে ত তাহার বিধান নাই দিদি! অতএব এক বৎসরের জন্য তোমাকে ধৈর্য্যধারণ করিতেই হইতেছে। তাই বলিয়া সুরমার বিবাহে বিলম্ব করা যাইতে পারে না। আজ

জ্যৈষ্ঠ মাসের পনরই, যাহাতে এই আষাঢ় মাসের মধ্যে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।”

দিদি বলিলেন, “মেয়ের বিয়ে যাতে শীঘ্র হয়, তার চেষ্টা ত করতেই হবে; কিন্তু এই কয়দিন হল বাবা-মায়ের শ্রাদ্ধে যথেষ্ট ব্যয় হয়ে গেল, এখন আবার এতগুলি টাকা কোথা থেকে আস্‌বে?”

আমি বলিলাম “দিদি, তুমি সে জন্য ভাবিও না। শ্রাদ্ধের সময় যে সব বড় বড় শিষ্য এসেছিলেন, তাঁদের আমি বলেছিলাম বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ পুত্রের শক্তিসাপেক্ষ, কিন্তু কন্যার বিবাহ শক্তিসাপেক্ষ নয়। পারি আর না পারি, মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই টাকা খরচ করিতেই হইবে। তা তাঁরা আমাকে ভরসা দিয়ে গিয়েছেন যে, দুই তিন হাজার টাকার জন্য কিছুই আট্‌কাবে না। তাই ত সাহস করে বলছি, আষাঢ় মাসের মধ্যেই সুরমার বিয়ে দেব।”

দিদি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “সবই হবে! কিন্তু মা-বাবা যে দেখে যেতে পারলেন না, এ দুঃখ আর যাবে না!”

আষাঢ় মাসেই সুরমার বিবাহ দিলাম। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুভূষণের সহিত সুরমার বিবাহ হইল। সুধাংশু তখন রিপন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিল। তাহাদের অবস্থাও খুব ভাল—ঘর, বর, বিষয়, সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম যাহা কিছু দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হয়, আমি একবারে তাহাই পাইয়াছিলাম। বরকর্ত্তা যদিও একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই, তবুও আমাকে যথেষ্ট ব্যয় করিতে হইয়াছিল। যে চায়, যে দর করে, অবস্থায় কুলাইলে তাহার সহিত পারিয়া উঠা যায়; কিন্তু যে দরদস্তুর করে না, ‘আপনার জামাই মেয়ে, যা দিতে হয় দিবেন’ বলিয়া এক কথায় সারিয়া দেয়, তাহার সহিত ব্যবহার করিতে বড়ই

বিবেচনা করিতে হয়;—আমারও তাহাই হইয়াছিল। সেই জন্যই আমার খরচ কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। বিশেষতঃ দিদির একমাত্র কন্যা—বাবা মা থাকিলে তাঁহারা যতদূর করিতেন, তাহার অপেক্ষা আমাকে অধিকই করিতে হইল। আপাততঃ সমস্ত দায় উদ্ধার হইল মনে ভাবিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ব্যাপারের মধ্যে রহিল আমার বিবাহ!—সে ত আর দায় নহে। যখন তখন করিলেই হইবে—আর না করিলেই বা কি! ভবিতব্য অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিলেন, "হাঁ, তাই-ই!"

আষাঢ় মাসে সুরমার বিবাহ দিলাম—আশ্বিন মাসে তাহার শাশুড়ী বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। বড়মানুষের বাড়ী, যথাসাধ্য পূজার তত্ত্ব পাঠাইলাম। পূজার কয়দিন পরে সুরমাকে আনিতে চাহিলাম; কিন্তু তাহার শাশুড়ী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না, বলিলেন, "কার্ত্তিক মাসটা এখানেই থাকুক; অগ্রহায়ণ মাসে শীত পড়িলে লইয়া যাইবেন।" সুরমাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া রাখিয়া আসিলাম। দিদির ঐ একমাত্র সন্তান,—তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিলাম।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন অপরাহ্ণ কালে আমার চতুষ্পাঠী গৃহের বারান্দায় বসিয়া আছি—এমন সময়ে একজন পিয়ন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এই কি হরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের টোল!"

আমি বলিলাম "হাঁ, কেন?"

পিয়ন বলিল "তাঁহার নামে একখানি টেলিগ্রাম আছে।" এখন পল্লীগ্রামে চিঠি পত্র সর্ব্বদা আসিয়া থাকে; কিন্তু টেলিগ্রাম অতি অল্পই আসে এবং যাহা আসে তাহাতে প্রায়ই বিপদের সংবাদ থাকে। সুতরাং টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক কাঁপিতে

লাগিল। আমি ভীতস্বরে বলিলাম, "আমারই নাম হরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ—দেখি কি টেলিগ্রাম!"

পিয়ন আমার হাতে টেলিগ্রাম দিলে আমি তাহার কাগজে সহি দিলাম এবং সে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক প্রার্থনা করায় তাহাকে তাড়াতাড়ি চারি আনা পয়সা দিয়া আমার প্রতিবেশী বসুদিগের বাড়ী টেলিগ্রাম পড়াইতে লইয়া গেলাম। বসুদের ছেলে খগেন্দ্র টেলিগ্রাম পড়িয়া বলিল যে, টেলিগ্রামে লেখা আছে সুধাংশু অত্যন্ত পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে যাইতে লিখিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি কেমন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিব তাহা ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু আর বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। দিদির নিকট গোপন করিবারও প্রয়োজন বুঝিলাম না; কারণ অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই যাইব।

তখনই বাড়ীতে আসিয়া দিদিকে টেলিগ্রামের কথা বলিলাম। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রতিবেশিনীরা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে। আগে কেঁদে কেটে অকল্যাণ করতে নাই,—এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার আয়োজন কর।"

দিদিকে লইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতা যাত্রা করিলাম। গাড়ী যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল, রাত্রি তখন সাড়ে এগারোটা। তাড়াতাড়ি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া সুধাংশুদের বাড়ী ভবানীপুরে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর নিকট যাইয়া দেখি, অত বড় বাড়ী একবারে অন্ধকার—কেবল সদর দরজায় একটি আলো জ্বলিতেছে। বাড়ী নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার দেখিয়াই আমি বুঝিলাম—সব শেষ হইয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী লাগিল। আমি নামিয়া পড়িলাম;—দিদিরও বিলম্ব সহিল

না—তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িলেন। গিরিশবাবু তখন জাগিয়া ছিলেন। তিনি গাড়ী থামিবার শব্দ পাইয়াই বাহিরের দিকে চলিয়া আসিতেছিলেন। দ্বারের নিকট আমাকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বেয়াই, আমার সুধা আর নাই।"—এই বলিয়া তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র দিদি "বাবা গো" বলিয়া দ্বারের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। আমি ও গিরিশবাবু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে তুলিতে গেলাম—দেখিলাম তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাঁহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িল—বাড়ীময় কান্নার রোল পড়িল।

বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে উপরে লইয়া গেলেন। তাহার পর গিরিশবাবুর নিকট শুনিলাম সেই দিন প্রাতঃকালে সুধাংশুর কলেরা হয়। সহরে যত বড় বড় চিকিৎসক আছে—সকলকেই দেখান হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—সন্ধ্যার সময় সকলকে ফাঁকি দিয়া সুধাংশু কোথায় চলিয়া গেল। হায় কলেরা, তুমি কি আমার যথাসর্ব্বস্ব লইবার জন্যই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। ঐ রোগে বাবা গেলেন, ঐ রোগে মা গেলেন, ঐ রোগে সুধা গেল; এখন আমাকে আর দিদিকে, লইলেই তর্কালঙ্কারের বংশ লোপ হয়; আমরাও বাঁচি!

দুই দিন সেখানে থাকিয়া তৃতীয় দিনে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা সুরমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। গিরিশবাবু শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত সুরমাকে রাখিতে চাহিয়াছিলেন—আমি বলিলাম, "সে যা হয়, আমি ওখানেই করিব।"—গিরিশ বাবু আর আপত্তি করিলেন না।

মনে করিয়াছিলাম ভাগিনেয়ীটীর বিবাহ দিলাম, এখন দিদিকে কাশী পাঠাইতে পারিলেই কিছুদিন হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিব।

তাহার পর যদি দুর্ম্মতি হয়, তাহা হইলে বিবাহ করিয়া ঘোর সংসারী হইব। এখন দেখিতেছি, সে সকল কল্পনাতেই রহিয়া গেল। যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি, বার বৎসর বয়সের বিধবা বালিকাকে লইয়া জ্বলিতে হইবে, পুড়িতে হইবে। দিদির যে প্রকার শরীরের অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে তিনি যে অধিক দিন বাঁচিবেন, তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। দিদির ভাল মন্দ হইলে সুরমাকে লইয়া কি করিব, সেই ভাবনাই আমার প্রবল হইল। শ্বশুরবাড়ী! সে সম্বন্ধ ত গঙ্গার তীরে চিতাভস্মে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেখানে সুরমাকে পাঠাইতে পারিব না। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম সুরমাকে শাস্ত্রাধ্যয়নে নিরত করিব। আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র যাহা পড়িয়াছি, তাহা তাহাকে পড়াইব;—যাহা পড়ি নাই তাহা নিজে পড়িয়া তাহাকে পড়াইব—চতুষ্পাঠী তুলিয়া দিব—সুরমাকে শিক্ষা প্রদান করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। এই সংকল্পে আমার মন স্থির হইল—বর্ত্তমান গভীর শোকে আমি কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলাম।

মানুষের কি বুদ্ধি। সে মনে করে, সেই বুঝি তাহার কার্য্যের কর্ত্তা, তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধি তাহারই হাতে রহিয়াছে; কিন্তু আর একজন আছেন, যিনি তোমার কল্পনা, তোমার সঙ্কল্প কিছুরই ধার ধারেন না। তুমি ইচ্ছা কর বা না কর—তাঁহার কার্য্য তিনি করাইয়া লইবেন। আমারও তাহাই হইল। দশদিনও বিলম্ব সহিল না—ইহারই মধ্যে আমার কল্পনা কোথায় উড়িয়া গেল, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কোথায় ভাসিয়া গেল। অদৃষ্টদেবীর নির্ম্মম কঠোর বিধানে আমার কি হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছি।

সুরমাকে বাড়ী লইয়া আসিবার তিন দিন পরেই একাদশী তিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। একাদশীর পূর্ব্ব দিন দিদি আমাকে বলিলেন

"হরচন্দ্র, কাল যে একাদশী। কেমন করিয়া ঐ কচি মেয়েকে এই সময়ে উপবাসী রাখব।" কথাটা আমি ভাবি নাই—কথাটা আমার মনেও হয় নাই। দিদি যখন একাদশীর কথা তুলিলেন, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম বার বৎসরের মেয়ের পক্ষে একাদশীর ব্যবস্থা কি ভয়ানক! পাঁচদিন পূর্ব্বে যাহাকে দিনের মধ্যে কতবার খাওয়াইলেও তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না. আজ এই পাঁচদিন পরে তাহার জন্য একাদশীর ব্যবস্থা করিতে হইবে ;—ব্রাহ্মণের বিধবা—নিরম্বু একাদশী। স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত আমি—অনেকের অনেক ব্যবস্থা দিয়াছি, কিন্তু আজ বিধবা ভগিনীর দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার নিরম্বু একাদশীর ব্যবস্থা দিতে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "ও কথা আর আমার কাছে তুলছ কেন দিদি? যা ব্যবস্থা হয় তুমিই কর।"

পর দিন একাদশী ;—সুরমার জন্য নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিবার, মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় জয়চন্দ্র তর্কালঙ্কারের গৃহে তাঁহার পণ্ডিত পুত্র আমি শ্রীহরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বর্ত্তমান—আমার ভাগিনেয়ীর জন্য অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা হইবে কেন? শাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিলে আমাদের চলিবে কেন? আর যে হয় ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু আমরা শাস্ত্রের বিধান কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারি না। তাহার জন্য যদি জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও অকাতরে দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া, দেশপূজ্য পণ্ডিতের দুহিতা আমার দিদি তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার জন্য নিরম্বু একাদশীর ব্যবস্থা করিলেন—আমি নীরবে তাহার অনুমোদন করিলাম।

বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সুরমা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতে লাগিল। সেদিন বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে নাই ; দিদির একাদশী ; কচিমেয়ে

সুরমার একাদশী—আর আমার জন্য আহার প্রস্তুত হবে ই? শাস্ত্রে ইহার ত বিধি নাই। আমারও সেদিন নিরম্বু একাদশী। পর পর তিন দিন উপবাসেও দিদিকে কাতরা করিতে পারে না ;—হিন্দু বিধবা, ব্রাহ্মণের বিধবার সে সব সয়। যাজক ব্রাহ্মণ আমি—আমাকে অনেক সময় উপবাসী থাকিতে হয়—বাল্যকাল হইতে আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান, এ সংযম অভ্যাস করিয়া থাকি। আগে যদি জানিতাম সুরমা দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা হইবে, তাহা হইলে তাহাকেও উপবাস করিতে শিক্ষা দিতাম। সে শিক্ষা ত তাহাকে দেওয়া হয় নাই ; তাই সুরমা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি সে দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলাম ;—মনে স্থির করিলাম, সুরমা ঘুমাইয়া গেলে অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিব। তাহার শুষ্ক মুখ, তাহার কাতর দৃষ্টি অসহ্য—একান্তই অসহ্য—আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও অসহ্য।

এ-পাড়া ও-পাড়া, এ-বাড়ী সে-বাড়ী ঘুরিয়া রাত্রি নয়টার পর গৃহে ফিরিলাম। মনে করিয়াছিলাম সুরমা ঘুমাইয়াছে ; কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি দক্ষিণের বারান্দায় সুরমা শুইয়া আছে, আর তাহার পার্শ্বে দিদি বসিয়া আছেন। আমি বারান্দায় উঠিবামাত্র সুরমা আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "মামা গো, একটু জল।"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বহুকষ্টে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া আমি বলিলাম, "দাও দিদি, ওর মুখে একটু গঙ্গাজল ;—ইহাতে যত পাপ হয় সব আমার। ইহার জন্য যদি নরকে যাইতে হয়, আমি সেখানেও যাইব, কিন্তু সুরমার এ কষ্ট আমি আর দেখিতে পারি না। দাও দিদি, ওর মুখে একটু গঙ্গাজল।"

দিদি সুরমাকে বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, রাত আর বেশী নাই,

একটু ঘুমাও, ভোর হইলেই তোমাকে জল খেতে দিব।" আমি বলিলাম, "দিদি, শাস্ত্র এমন নির্দ্দয়, নয়, বালিকা বিধবার জন্য এ কঠোর ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই, আমি বল্‌ছি শাস্ত্রে নাই ; তুমি —"

আমার কথায় বাধা দিয়া দিদি বলিলেন, "হরচন্দ্র, এমন ব্যবস্থা দিও না। একাদশীর দিনে ব্রাহ্মণের বিধবার জলগ্রহণ করিতে নাই,—বাবার কাছে একথা শুনেছি—দাদামহাশয়ের কাছে একথা শুনেছি। চোদ্দ বছর বয়সে সুরোকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়ে এ ব্যবস্থা প্রতিপালন করেছি।"

আমি বলিলাম, "তবে তাই হউক—জল জল করে সুরমা মরুক—তুমি আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখি।"

সুরমা আমার মুখের দিকে চাহিল, অতি ক্ষীণকণ্ঠে আর একবার বলিল, "মামা, জল—একটু জল"—

তাহার পরই সে কণ্ঠ নীরব। পরদিন প্রাতঃকালে দেখিলাম তাহার জ্বর হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিলাম। তিন চারি দিন ধরিয়া চিকিৎসা করাইলাম ; কিন্তু তাহাকে কোনও ক্রমে বাঁচাইতে পারিলাম না। সেই যে একাদশীর রাত্রে বলিয়াছিল, "জল—একটু জল—" তাহার পর আর সে মুখে একটি কথাও শুনিতে পাই নাই। ব্রাহ্মণের বিধবা—দ্বাদশ বর্ষীয়া বালবিধবা—একবিন্দু জলের জন্য ছটফট করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। আমরা সে দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিলাম, একটী কথাও বলিতে পারিলাম না। শাস্ত্রের আদেশ কি লঙ্ঘন করা যায়? শাস্ত্রের আদেশ প্রতিপালিত হইল—অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল—বার বৎসরের মেয়েকে নিরম্বু একাদশীর নিকট বলি দিতে হইল। দিদি দিন রাত কাঁদিতেছেন,—কি বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিব। কাশী যাইতে বলিলাম ; তিনি আমাকে ফেলিয়া কোথাও যাইবেন না।

কিন্তু বাড়ীতে যে তিষ্ঠিতে পারি না, তাহার কি করি? প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীর ভিতরের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেই আমার কর্ণে সেই বালিকার কাতর আর্ত্তনাদ প্রবেশ করে—"মামা, জল—একটু জল।" এ আর্ত্তনাদ যে আর আমি সহ্য করিতে পারি না। হায় ভগবান.! এ কি ভীষণ শাস্তি!

"জা, কাম কর্‌বিনে ?"

পদ্মাপারে ছোট একখানি গ্রাম। গ্রামের নাম রাজনগর। সারা রাজনগর খুঁজিলেও এবং তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও কোন রাজা বা রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। রাজনগর গ্রামে আছে এক ঘর ছোট খাট জমীদার, আর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, মালী, ধোপা, নাপিত, মুসলমান প্রভৃতিতে প্রায় দেড়শত ঘর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রাজনগরের ছোট জমীদার অর্থে ছোট হইলেও নামে ও প্রতাপে কম ছিলেন না। বার্ষিক দশ বার হাজার টাকার মুনাফার জমীদারির মালেকের নাম ছিল গজেন্দ্রনারায়ণ রায়; আর এই গজেন্দ্রবাবুর প্রতাপে তখন বাঘে গরুতে না কি এক ঘাটে জল খাইত।

জমীদার গজেন্দ্রনারায়ণ বাবুর প্রতাপ এত বৃদ্ধি হওয়ার প্রধান কারণ ছমির সর্দ্দার। ছমিরের মত খেলোয়াড়, ছমিরের মত পাকা লাঠিয়াল, ছমিরের মত অসম-সাহসী বীর সে সময়ে ও-তল্লাটে ছিল না। ছমিরের বাপ এনাতুল্লা সর্দ্দার, ঐ জমীদার বাড়ীতেই পাইকের কাজ করিয়া জীবন শেষ করে। পিতার মৃত্যুর পর ছমির পিতার পদ প্রাপ্ত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই পদ্মাপারের লোকে বুঝিতে পারে যে, ছমির সর্দ্দারের লাঠির সম্মুখে দাঁড়ায়, এত বড় সাধ্য কাহারও নাই। ছমির একাকী পঞ্চাশ জন বাছা বাছা খেলোয়াড়ের মহড়া লইতে পারিত।

জমীদার-পুত্র গজেন্দ্রনারায়ণ বাবু ছমিরের সমবয়স্ক ছিলেন। ছমিরই উৎসাহ দিয়া বাবুজিকে লাঠিখেলা শিক্ষা দেয়। তাহার পর গজেন্দ্র-নারায়ণ বাবু চব্বিশ বৎসর বয়সের সময় যখন জমীদারীর কর্ত্তা হইলেন, তখন ছমির সর্দ্দারই তাঁহার দক্ষিণহস্ত হইল। গজেন্দ্রনারায়ণ ছমিরের পরামর্শে অনেক দুঃসাহসিক কার্য্যে পর্য্যন্তও প্রবৃত্ত হইতেন এবং কোনও কার্য্যে বিফলমনোরথ না হওয়ায় তাঁহার উৎসাহ ও লোভ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লুট ডাকাতি, বলপূর্ব্বক পরের জমী দখল, কিছুতেই গজেন্দ্রনারায়ণ বাবু পশ্চাৎ-পদ হইতেন না। ছমির সর্দ্দার ছায়ার ন্যায় মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিত।

জমীদার গজেন্দ্রনারায়ণ ছমিরকে কতবার বিবাহ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ছমির শুধুই বলিত "হুজুরের মেহেরবানীতে বেশ আছি। ওসব লেঠার মধ্যে গেলি পরে' কব্জিতি আর জোর থাকবি নে। অমন কামও কি করে? যে কডা দিন আছি, লাঠি-খান কোলে করে এই দেউড়ীতেই কাটায়ে দেব।" ছমিরের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কেহ আর তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত না। কিন্তু তাই বলিয়া ছমির যে একেবারেই হিংস্র পশুর মত ছিল, তাহাও ত মনে হয় না। দাঙ্গা করিতে গিয়া সে কত জনের মাথা কাটাইয়া দিয়াছে, কত জনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, কতজনের ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে; তখন তাহাকে দেখিলে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া বোধ হইত। মাথায় বাবড়ী চুলের গোছা ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর একখানি লাল গামছা বাঁধা, ডান হাতে একখানি রক্ষাকবচ বাঁধা, হাঁটুর উপর মালকোঁচা করিয়া কাপড় পরা—জবা ফুলের মত রাঙ্গা বড় বড় দুইটা চক্ষু, প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ—সে দেহ যেমন

লম্বা তেমনি চওড়া। ছমির যখন কোন যুদ্ধযাত্রা করিবার সময় তাহার সেই পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া জমীদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ভীষণ স্বরে 'রে রে রে রে দীন' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত, তখন নিকটের পাঁচসাত খানি গ্রামের লোকের ভয়ে হৃদ্‌কম্প হইত। কিন্তু যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা, গোলমাল কিছুই থাকিত না, তখন ছমির সর্দ্দার আর এক মানুষ হইয়া যাইত; তখন তাহার হাস্য কৌতুকে, বালকের ন্যায় কোমল ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। ছমির ভবিষ্যৎ-চিন্তা করিত না। কাল কি খাইবে ভাবিয়া একটি পয়সাও সঞ্চয় করিত না। লুট তরাজ করিয়া যেখানে যাহা পাইত, জমীদার বাড়ীতে নানা উপলক্ষে যাহা কিছু পুরস্কার পাইত, সমস্তই সে গ্রামের গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দিত; চিড়ে মুড়কী বাতাসা কিনিয়া গাঁয়ের ছেলেদের খাওয়াইয়া দিত। তখন কেহই মনেও করিতে পারিত না, এই ছমির সর্দ্দার দাঙ্গা হাঙ্গামার নামে নাচিয়া উঠিতে পারে, দশ বিশটা কাঁচা মাথা উড়াইয়া দিতে অনুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না, লোকের ঘরে আগুন দিয়া রোশনি দেখিয়া প্রফুল্ল হয়! ছমির সর্দ্দার বলিত "লাঠিখান হাতে করলি আমার গর্দ্দানে ভূত চাপে; তখন আর আমি ছমির থাকিনে, তখন আমারে সয়তানে ধাওয়া করে, তা ন'লি কি যার তার মাথায় বাড়ি দিতি পারি!"

এই ভাবে কিছুদিন চলিয়া গেল। ছমিরের বয়স যখন চল্লিশ বৎসর, জমীদার গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের যখন অতুল প্রতাপ, সেই সময়ে একদিন জমীদার বাবু ছমির সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিলেন "ছমির ভাই, এই অমাবস্যার দিন শানগরের হাট লুঠ করতে হবে। হাটের দখল নিয়ে মামলা মোকর্দ্দমা আমি করব না। ও হাটের মালিক আমরাই ত ছিলাম, এখনই না হয় খাঁয়েদের হাতে গিয়েছে।

—ও হাট দখল করা চাই-ই। তুমি লোকজন ঠিক কর, অমাবস্যার আর তিন দিন বাকী, এই তিনদিন পরেই হাট লুট করতে হবে।”

এ সকল ব্যাপারে ছমিরের উৎসাহ বাবুর অপেক্ষাও অধিক ছিল, নতুবা বাঁবু এত প্রতাপশালী হইতে পারিতেন না। কিন্তু, কি জানি কেন, ছমির এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। সে বলিল “বাবুজী, শানগরের হাট লুঠ করে কাজ নেই। ওর থেকে বল, সুলতান-গঞ্জের হাঠ লুঠ করে আসি। শানগরের গায়ে হাত দিও না বাবু!”

গজেন্দ্র বাবু বিস্মিত হইয়া ছমির সর্দ্দারের মুখের দিকে চাহিলেন। সে ত কখনও এরূপ কার্য্যে আপত্তি করে না। আজ তবে তাহার কি হইল! বাবু বলিলেন, “এমন কথা ত তোমার মুখে কখনও শুনিনি ছমির ভাই!” ছমির বলিল “আমিও তাই ভাবতিছি। এমন কথাডা কলাম কিসির জন্যি। দেখেন বাবুজী, কথাডা আমি কইনি, কেডা জানি আমার মুখ দিয়ে কওয়াল। না বাবুজী, শানগর লুঠ করা হবিনে।” গজেন্দ্র বাবু কোন দিন কোন কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হন নাই; যখন যাহা করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতেই ছমির সর্দ্দার বিশেষ আগ্রহ সহকারে সম্মতি প্রদান করিয়াছে; আজ অকস্মাৎ ছমিরের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়া গজেন্দ্র বাবুর জিদ বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, “সে কিছুতেই হবে না, যা আমি বলেছি তা করতেই হবে। এই অমাবস্যার রাত্রিতে শানগরের হাট লুঠ করা চাই-ই চাই। এ কাজ তোমাকে করতেই হবে!” ছমির সর্দ্দার অন্যমনস্কভাবে বলিল, “এ্যাঁ—এ কাম কর্ত্তিই হবি!” তাহার পর তীব্রস্বরে বলিল, “শোন বাবুজী, কাম কর্ত্তিই যদি হয় ত কর্ব্ব, কিন্তু আগেভাগেই কয়ে রাখ্‌ছি, কামডা ভাল হবিনে; শেষে কিন্তু আমারে দোষ দিতি পার্ব্বা না।” গজেন্দ্র বাবু একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, ‘তোমার আজ কি হয়েছে

সর্দ্দার? বেশ, তোমার ইচ্ছে না হয়, তুমি যেও না। এত দিন ত তুমি সর্দ্দারি করেছ, এই একটা কাজের সর্দ্দারি না হয় আমাকেই করতে দাও।" ছমির বলিল, "বাবুজী, সর্দ্দারি দিতি পারি, কিন্তু শানগরের কামে না। ও মৎলব ছাড়ান দ্যান।" গজেন্দ্রবাবু রাগিয়া বলিলেন "কিছুতেই না। আমি ও হাট লুঠ করবই।"

সহসা ছমির সর্দ্দারের স্কন্ধে ভূত চাপিল। সে ক্রোধে দিশাহারা হইয়া বলিয়া বসিল, "ছমির সর্দ্দারের হাতে এই লাঠি থাক্‌তি কারও সাধ্যি নেই ও হাট লুঠ করে! আমি ও হাট লুঠ কর্ত্তি দেব না—খোদার হুকুম।"

গজেন্দ্রবাবু গর্জ্জিয়া বলিলেন, "আমি ও হাট লুঠ করব—মা কালীর আদেশ।" গজেন্দ্র বাবু ক্রোধে অধীর হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ছমির সর্দ্দার মাথায় হাত দিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল, এ বুদ্ধি তাহাকে কে দিল! এত কালের মধ্যে কোন দিন ত সে এমন কথা বলে নাই। তবে আজ শানগর লুঠের প্রতিবাদী সে কেন হইল। সুলতানগঞ্জের বড় হাট সে লুঠ করিতে পারে, আর শানগরের ছোট হাটটা লুঠ করিতে তার অনিচ্ছা! এ কথা তার মুখে আসিল কেমন করিয়া! কে তাহাকে এ কার্য্যে বার বার নিষেধ করিতেছে? ছমির অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল, এক কথাই পাঁচবার করিয়া ভাবিল। কিন্তু তাহার সকল ভাবনার মধ্য হইতে, কে যেন থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিতে লাগিল এমন কর্ম্ম করিও না। এমন উপদেশ, এমন হুকুম তাহার মনের নিকট হইতে ত কোন দিন আসে নাই! অনেক ভাবিয়া সে যখন কোনই কিনারা পাইল না, তখন বিরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল "ভালই হোক, আর মন্দই হোক, ও কামে আমি যাচ্ছিনে।" এই বলিয়া ছমির সর্দ্দার বাহিরে চলিয়া গেল।

গজেন্দ্রবাবু অপরাহ্ণকালে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে অনেক ছোট-খাটো সর্দ্দার ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাদের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখনই তাহারা শুনিল যে, ছমির সর্দ্দার এ কার্য্যে অগ্রসর হইবে না, বরঞ্চ বাধা প্রদান করিবে, তখন তাহারা একবাক্যে অস্বীকার করিল ; তাহারা বলিল, "ওস্তাদজি যখন এ কামে হাত দিতি নারাজ, তখন আমরা যাবো না।" সকলেরই এক কথা। গজেন্দ্রবাবু বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন। সর্দ্দারদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল ছমির সর্দ্দারকে ডাকিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করিবেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিল। অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাহিরে যাইয়া দেখেন তাঁহার ছোট মেয়ে খুকী ছমির সর্দ্দারের কোলে বসিয়া গল্প করিতেছে। খুকী অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, আর ছমির সর্দ্দার 'হুঁ হুঁ' করিয়া যাইতেছে এবং দুই একটা কথার উত্তরও দিতেছে। গজেন্দ্রবাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহিরের উঠানে বেড়াইতে লাগিলেন।

এদিকে অনেক কথার পর খুকী রাগ করিয়া বলিল "জ্যা, তোমার সঙ্গে আড়ি।" খুকী ছমিরকে জ্যেঠা বলিতে পারিত না, জ্যা বলিত। ছমির বলিল, "আড়ি কিসির জন্যি মা!" খুকী বলিল "তুমি ভাল ক'রে কথা ক'চ্ছ না যে।" ছমির বলিল "মা, মনডা ভাল নেই।" খুকী বলিল "ক্যান্?" ছমির বলিল "একটা কাম করি কি না করি, তাই ভাবতিছি।" খুকী না বুঝিয়াই বলিয়া ফেলিল, "কাম করিস নে, জ্যা!" কথাটা গজেন্দ্রবাবুর কাণে গেল। তাঁহার মনে হইল, কে যেন খুকীর মুখ দিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিতেছে।

তিনি তখন ছমিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খুকী তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল "বাবা, জ্যা কাম করবি নে।" কথাটা ছমির আর এক ভাবে গ্রহণ করিল; সে তখন দাঁড়াইয়া বলিল "বাবুজি, তুই পুরুষ আপনার নেমক খাইচি, আর খাবো না, আমি আর কাম করবো না। মা আমায় বিদেয় দিছেন। খুকী, কাম আর করতিছি নে, তোর হুকুমই বহাল। আজ থিকে আমার কামে ইস্তাফা।"

খুকী বলিল "জ্যা, তুই আর কাম করিস্ নে, তুই আমার সঙ্গে খেলা করবি, কেমন?"

ছমির বলিল "আমার একেবারে ছুটী মা! আমি আর এ গ্যাশেই থাক্‌ব না। তুই ত আমারে ছুটী ক'রে দিলি।"

গজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ছমির ভাই, তোমার হ'ল কি? তোমার মুখে এ সব কি কথা? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

ছমির বলিল "আমিও বুঝ্‌তি পারতিছি নে। না, না, কাম আর করবোই না। কিন্তুক বাবুজি, আমার কাছে একটা সত্যি কর্‌তি হবি। সত্যি কর যে, শানগরের হাট লুঠ করবা না।"

গজেন্দ্রবাবু বলিলেন "শানগরের হাটে তোমার কি আছে যে, তুমি ঐ হাটের দিক হয়ে এত কথা বল্‌ছ।"

ছমির বলিল "কিছুই নেই—কিছুই নেই বাবুজি! আমার এই পরাণডার মদ্দি যেন কেডা বল্‌তিছে, ও হাট লুঠ করলি রাজনগরের জমিদেরী থাক্‌বি নে।"

গজেন্দ্রবাবু আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; তিনি বলিলেন "একবার মনে করেছিলাম, যে কাজে তোমার আপত্তি, দূর হোক্ তা আর ক'র্‌ব না। কিন্তু তা আর হোলোই না। এখানকার পাজী বেটারা কাজ করতে চায় না। আমি ওপার থেকে সর্দ্দার লোকজন নিয়ে আস্‌ব।

দিয়াছেন, সেই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল ! তিনি ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন একমাত্র কন্যা খুকীকে কোলে করিয়া তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণী দক্ষিণ হস্তে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। গজেন্দ্রবাবু তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পালাও সুরবালা, পালাও—মেয়েকে বাঁচাও—নিজেকে বাঁচাও। আজ ছমির ভাই নাই—সব আজ যাবে।"

সুরবালা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, "ওগো তুমি কি পাগল হয়েছ ? বাইরে একশো, দেড়শো লোক, তুমি একেলা কি করবে ? পালিয়ে এস ! প্রাণে বাঁচলে সব হবে।"

গজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তা হয় না সুরবালা—তা হবে না। ছমির ভাই আমাকে পালাতে শেখায়নি। তুমি পালাও—আমি এই দোরে দাঁড়িয়ে একেলা একশো লোককে ঠেকাতে পারব।"

সুরবালা বলিলেন, "আমিও তবে পালাব না, তুমি মরতে জান, আমি জানিনে !" এই বলিয়া তিনি স্বামীর হাত ছাড়িয়া দিয়া কন্যাকে কোলে লইয়া তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন।

ঝন্ ঝন্ করিয়া প্রকাণ্ড দ্বারের শিকল খুলিয়া পড়িয়া গেল—দ্বার উন্মুক্ত হইল—সকলে সবিস্ময়ে দেখিল এক হস্তে ঢাল ও অপর হস্তে লাঠি লইয়া জমীদার গজেন্দ্রবাবু দ্বারপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ডাকাইতেরা হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া একটু হটিয়া গেল, তাহার পরই 'দীন্ দীন্' শব্দ করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। গজেন্দ্র বাবু দক্ষিণপদ সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে লাঠি চালাইতে লাগিলেন। ডাকাইতের দল দুই তিন মিনিট চেষ্টা করিয়াও দ্বারপথে প্রবেশ করিতে পারিল না ; তাহারা জানিত গজেন্দ্রবাবু এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। তিনি হয় ত যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া নিজের ও পরিবারের প্রাণরক্ষা করিবেন। গজেন্দ্রবাবুকে আহত করা বা রমণীদিগকে অপমান করার অভি-

প্রায় তাহাদের ছিল না। তাহারা যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াই ওস্তাদের অপমানের প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না। বীরের জাতি মুসলমানগণ গজেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক এই ভাবে পরাভূত হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখন আর তাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকিল না। সম্মুখদিকে যাহারা ছিল, তাহারা ক্রমাগত গজেন্দ্রবাবুকে লাঠির আঘাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। গজেন্দ্রবাবু তাহাদিগের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে অকস্মাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বক্ষস্থলের দক্ষিণ দিকে বিদ্ধ হইল। গজেন্দ্রবাবু সেই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বারপার্শ্বে পতিত হইলেন। তখন সকলে চাহিয়া দেখিল, গণেশ-জননী দুর্গার ন্যায় খুকীকে কোলে লইয়া জমীদার-গৃহিণী ধীর স্থির ভাবে দণ্ডায়মানা। এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া ডাকাইতগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদের এক পদও নড়িবার শক্তি রহিল না।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উল্কাবেগে লাঠি হস্তে কে একজন আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহার বিপুল কেশরাশি বাতাসে উড়িতে লাগিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলি ও কর্দ্দমলিপ্ত; তাহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন। সকলে চাহিয়া দেখিল দ্বারের সম্মুখে ছমির সর্দ্দার দণ্ডায়মান। ওস্তাদকে দেখিয়া ডাকাইতদল কয়েক পদ পিছাইয়া গেল। ছমিরের তখন পশ্চাদ্দিকে দেখিবার অবকাশ ছিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "বেইমান সব, একদিনিই সব ভুলি গিয়িছিস্?" ডাকাইতদিগের মধ্য হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, "ওস্তাদজি, তোমার অপমানের শোধ নিতি আসিছেলাম।" সর্দ্দার বলিল, "কই আর শোধ নিলি বাপজানেরা? আমার বুকি বর্শা বিঁধিয়ে শোধ নে। যা সব চলে যা।" তখন দেখিতে দেখিতে ডাকাইতের দল অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

ছমির সর্দ্দার এতক্ষণ পরে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে গজেন্দ্রবাবু বর্শাবিদ্ধ হইয়া দ্বারের পার্শ্বে পড়িয়া আছেন, ক্ষতস্থান দিয়া অল্প অল্প রক্ত বাহির হইতেছে,—আর তাঁহার মস্তকের নিকট তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া খুকীকে কোলে লইয়া নীরব নিস্পন্দ ভাবে সুরবালা দাঁড়াইয়া আছেন।

ছমির সর্দ্দার চীৎকার করিতে করিতে সামলাইয়া গেল। ক্ষতস্থানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সে সুরবালাকে বলিল, "বৌ মা, এই জায়-গাডা চাপে ধরে রাখ—আমি এখনই অষুদ নিয়ে আস্‌তিছি।"—এই বলিয়া ছমির ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে দৌড়াইল এবং দেখিতে দেখিতে কতক-গুলি গাছের পাতা লইয়া ফিরিয়া আসিল। ছমির অচেতনপ্রায় গজেন্দ্রবাবুর পার্শ্বে বসিয়া বাম হস্তে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল এবং দক্ষিণ হস্তে অতি সুকৌশলে বর্শাটি টানিয়া বাহির করিল। বর্শা হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিতে পারে নাই। তখন কয়েকটা পাতা চিবাইয়া তাহার রস সে ক্ষত-স্থলে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল, অপর তিন চারিটি পাতা দ্বারা ক্ষতের উপরি-ভাগ আবরণ করিয়া বলিল, "শীগগির, একখান কাপড় আন।" একজন তখনই কাপড় দিল। ছমির সুদক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় সমস্ত বক্ষস্থল বেষ্টন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। তাহার পর পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে বলিল "এখন শিগ্‌গির একজন ডাক্তার ডাক্‌তি যাও।"

খুকী এতক্ষণ ভয়ে মায়ের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ছিল। এখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, তাহার পিতার পার্শ্বে ছমির বসিয়া আছে। সে তখন বলিল, "জ্যা, কাম করবি নে?" ছমির হা হা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মায়ের কোল হইতে খুকীকে লইয়া তাহার সেই বিশাল বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মা আমার, আর একটু হল্লিই ত কাম শেষ হচ্চিল। আরে শোলার রাগ!—"

"না"

একটা কথা অনেক সময়ে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—"এই যে আপনি হিমালয় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, সেখানে কি কখন কোন ভাল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই?" আমি সকলকে একই উত্তর দিয়াছি—"ভাল চোখ থাকিলে তবে ত ভাল লোক খুঁজিয়া বাহির করা যায়। আমার চক্ষু ছিল না, তাই ভাল লোক দেখিতে পাই নাই।" আমার এই উত্তর শুনিয়া সকলেই নীরব হইয়াছেন।

কিন্তু সত্যসত্যই কি আমি ভাল লোক দেখিতে পাই নাই?—কথাটা অস্বীকার করিলে পাপ হয়। যাঁহাদের সহায়তায়, যাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, যাঁহাদের কৃপায় আমি অশেষ বিপদে রক্ষা পাইয়াছি, ঝড়-বৃষ্টিতে, অর্দ্ধাশন-অনশনে ক্লান্তি বোধ করি নাই, গভীর অরণ্যে, জনহীন দুর্গম পর্ব্বতক্রোড়ে, গভীর নিশীথে একাকী বাস করিতে অনুমাত্র ভীত হই নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাল মানুষ—দেবতাস্থানীয়—দেবতা বলিতেও আমি সঙ্কুচিত নহি। এই সকল সাধু মহাত্মার যে অযাচিত অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ করিয়াছি, তাহার কোন বিবরণ আমার "হিমালয়" "প্রবাস-চিত্র" বা "পথিকে" আমি প্রায়ই লিপিবদ্ধ করি নাই—ইচ্ছা করিয়াই করি নাই। কেবল একবার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে 'সাহিত্য' পত্রে "অতিপ্রাকৃত কথা" শিরোনামে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম; তাহার পর এই এতকালের মধ্যে কোন দিন সে সকল কথার উল্লেখ করি নাই।

এখন মনে হইতেছে জীবনের শেষপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আর সে কথাগুলি মনে রাখিয়া যাই কেন? এমন এক সময় ছিল, যখন দশ-জনের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আস্থা-অনাস্থার কথা মনে উঠিত। এখন এই খেয়াঘাটে দাঁড়াইয়া সে কথা আর বড় একটা মনে আসে না। তাই আজ পাঠকগণের নিকট একটি অতীত কাহিনী বলিব। ইহার মধ্যে "অতিপ্রাকৃত" কিছু নাই; তবুও কথাটা এতদিন বলি নাই। এমন অনেক কথা আমার মনে আছে।

সে অনেক দিনের কথা। হিমালয়প্রদেশে তখন আমার এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি দেরাদুনে থাকিতাম, অল্প বিস্তর এটা ওটা করিতাম! হঠাৎ এক এক দিন জঙ্গলে, পর্ব্বতে মাথা দিতাম, দুই তিন দিন আর ফিরিতাম না; তাহার পর একদিন আসিয়া লোকালয়ে উপস্থিত হইতাম। আমার বন্ধু বান্ধবগণ আমার অদর্শনে ব্যস্ত হইতেন না; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, যদি মরিয়া না যাই তাহা হইলে তাঁহাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমি একেবারে উধাও হইয়া যাইতে পারিব না।

এই প্রকার অবস্থায় একদিন অতি প্রত্যূষে আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোনও সংবাদ না দিয়া দেরাদুন ত্যাগ করি। সহর হইতে কিছু দূরবর্ত্তী টপকেশ্বর শিবের স্থান আমার বড়ই ভাল লাগিত; আমি যখন তখন সেখানে যাইতাম। অনেক সময়ে সেই শিবের পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রিও কাটাইয়া দিয়াছি। এখন যে বারের কথা বলিতেছি, সেবারেও বাসা হইতে বাহির হইয়া বরাবর টপকেশ্বরে গিয়াছিলাম। কিন্তু সে দিন কি একটা উপলক্ষে অনেক গুর্খা নরনারী, বালকবালিকা প্রাতঃকালেই টপকেশ্বরে সমবেত হইয়াছিল। অন্য দিন হইলে হয় ত আমি এ জনতায় অসুবিধা বোধ করিতাম না, সেইখানেই থাকিয়া যাইতাম। কিন্তু সেদিন কি জানি কেন, অথবা আমার সৌভাগ্যক্রমে,

জনতা ভাল লাগিল না। আমি তখন টপকেশ্বরের বাঁধান উচ্চ পথ ছাড়িয়া নির্ঝরতীরে নামিয়া গেলাম। নির্ঝরে তখন অল্প জলই ছিল; তবে স্রোতঃ কিঞ্চিৎ প্রবল ছিল। আমি নির্ঝরের পার্শ্ব দিয়া উত্তরাভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি স্থানে জলধারা সঙ্কীর্ণ দেখিয়া অতি সাবধানে নির্ঝর পার হইয়া গেলাম। দুই দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, তাহারই মধ্য দিয়া নির্ঝরই বলুন—আর নদীই বলুন, নিম্নাভিমুখে চলিয়া যাইতেছিল। অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম এই নির্ঝরতীরে পর্ব্বতগাত্রে অনেকগুলি সুন্দর গহ্বর আছে। শুনিতাম মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন সাধু সন্ন্যাসী সেই স্থানে আসিয়া থাকেন। টপকেশ্বর শিবের সম্মুখস্থ অপর পারের পর্ব্বতগাত্রে এই প্রকার দুই একটি গুহা দেখিয়াছিলাম; কিন্তু সে গুলিতে সাধু সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দেখি নাই। সে দিন যেখানে উপস্থিত হইলাম, সেখানে তিন চারিটি অতি সুন্দর গুহা ছিল। আমার তখন ইচ্ছা হইল ইহারই একটি গুহায় সমস্ত দিন কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া যাইব।

এই স্থানে আমার বেশভূষার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। তখন বর্ষাকাল, তাই আমার পরিধানে একখানি ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী, মাথায় একটি প্রকাণ্ড পাগড়ী, হস্তে দীর্ঘ যষ্টি; পদ্মুকাও ছিল, কিন্তু ঝরণা পার হইবার সময় তাহা অপর পারে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। সে সময়ে আমাকে দেখিলে কেহই বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিতেন না।

এই অবস্থায় পর্ব্বতগাত্রে দুই তিনটি গুহা দেখিয়া আমি সেই গুহাগুলির উদ্দেশে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের পার্শ্ব তেমন ঢালু ছিল না, সুতরাং গুহাগুলির নিকটবর্ত্তী হইতে আমাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। আমি প্রথমে যে গুহার সম্মুখে

গেলাম, সেটি একটু সঙ্কীর্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন। তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় এবং স্বচ্ছন্দে উপবেশন করাও যায়; কিন্তু তাহার মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান হয় না। সেখান হইতে চাহিয়া দেখিলাম অনতিদূরে একটু উচ্চে আর একটি গুহা রহিয়াছে। সেই গুহার নিকটে যাইয়া দেখিলাম তাহার বহির্ভাগ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে হইল কে যেন সেই দিনই বা তাহার পূর্ব্বদিন গুহার সম্মুখভাগ পরিচ্ছন্ন করিয়াছে। আমি সেই গুহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র গুহার অভ্যন্তর হইতে অতি কোমলকণ্ঠে কে বলিলেন "আসুন।"

এই হিমালয়ের নিভৃত প্রান্তে, নির্ঝরের পার্শ্বে জনশূন্য স্থানে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গুহা হইতে আমারই মাতৃভাষায় কে আমাকে এমন মধুর স্বরে অভ্যর্থনা করিল,—আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।—বিস্ময়াকুল চিত্তে আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলাম।

আমাকে নিশ্চল দেখিয়া পুনরায় তেমনই মধুর স্বরে গুহার ভিতর হইতে আহ্বান আসিল "আসুন।"

আর দাঁড়াইয়া থাকা অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমি সেই গুহার দ্বারের নিকট গেলাম। আমাকে দেখিয়াই গুহার মধ্য হইতে একটি মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিলেন। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখে সহাস্যবদনে এক দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। পরিধানে গৈরিকবাস, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকের বিপুল কেশরাশি আলুলায়িত! এ যে সত্যসত্যই দেবীমূর্ত্তি—এ যে সত্যসত্যই মাতৃমূর্ত্তি।

আমি তখন প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলাম, কথা বলিতে ভুলিয়া গেলাম, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিবারও শক্তি অপহৃত হইল। আমি নিশ্চলভাবে সেই দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাকে

তদবস্থ দেখিয়া সেই দেবী বলিলেন "ভিতরে আসিয়া বসুন। আমি আপনারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

"আমার—আমি—"আমি আর কিছুই বলিতে পারিলাম না। তখন সেই দেবী বলিলেন "হাঁ, আমি কা'লই চলিয়া যাইতাম; কিন্তু আপনার জন্যই এখানে অপেক্ষা করিয়া আছি।"

আমার তখন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। সেই দণ্ডায়মানা দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া অতি ধীর-স্বরে বলিলাম, "আমার অপেক্ষায় আপনি রহিয়াছেন? আমি যে আজ এখানে আসিব, একথা দশ মিনিট পূর্ব্বে আমিই ভাবি নাই।"

দেবী উত্তর করিলেন, "আপনি না ভাবিতে পারেন, আমি কিন্তু জানিতাম। আপনি ভিতরে আসিয়া বসুন; তখন কথাবার্ত্তা হইবে।"—এই বলিয়া তিনি গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কেবল একখানি মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত রহিয়াছে; ত্রিশূল, কমণ্ডলু বা অন্য কোন দ্রব্যই গুহার মধ্যে দেখিলাম না। দেবী সেই মৃগচর্ম্মখানি আমার দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই খানিতে বসুন।"

"আসনের প্রয়োজন নাই"—বলিয়া আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম; দেবীও আসনখানি সরাইয়া রাখিয়া মাটিতেই বসিলেন।

তখন আমিই প্রথমে কথা বলিলাম; আমি বলিলাম, "আমি যে বাঙ্গালী, তাহা আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

দেবী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আসিবেন, আপনার সহিত দেখা হইবে, ইহা যখন জানি, তখন আপনি যে বাঙ্গালী তাহা আর জানি না! আমি আপনাকে চিনি।"

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই হিমালয়প্রদেশে অনেক সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী, ভৈরব-ভৈরবী দেখিয়াছি; কিন্তু এ মূর্ত্তি ত কখনও দেখি নাই, কখনও কোন সন্ন্যাসিনীর সহিত বাক্যালাপও করি নাই। তবে ইনি আমাকে কেমন করিয়া চিনিলেন? আমি দেরাদুনে থাকি, কখন কোথায় যাই তাহার স্থিরতা নাই, কখন কি করিব তাহা আমিই জানি না। সে দিন যে ওখানে যাইব, সে দিন যে বাসার বাহির হইব—একথা পূর্ব্ব রাত্রিতেও আমি চিন্তা করি নাই। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে অকস্মাৎ আমার মাথায় খেয়াল চাপিল, আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। তখনও জানি না কোথায় যাইব; অথচ ইনি এই নির্জ্জন গিরিগুহায় আমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন বলিতেছেন। বিস্ময়ের বিষয় নহে কি?

আমাকে চিন্তাকুল দেখিয়া দেবী বলিলেন, "ও সব কথা থাক, আপনি আজ এখানে থাকিবেন?"

আমি বলিলাম, "না, আমি এই দিকে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, এখনই চলিয়া যাইব; আপনার কার্য্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করিব না।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করা ব্যতীত এখানে ত আমার অন্য কাজ নাই। আমি কালই চলিয়া যাইতাম। বলিয়াছি ত যে আপনার সহিত দেখা হইবে বলিয়াই এখানে অপেক্ষা করিতেছি।"

আমি তখন অতি ধীরভাবে বলিলাম, "ক্ষমা করিবেন, আপনার কথা আমি আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না।"

তিনিও ধীরভাবে বলিলেন, "বুঝিবার বিশেষ প্রয়োজনও দেখিতেছি না।" সেই সময় আকাশে মেঘ করিয়া আসিল। তিনি এই মেঘাড়ম্বর দেখিয়া বলিলেন, "এখানে থাকা আর নিরাপদ নহে, একটু পরেই

মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই এই নদীতে জল-স্রোত আসিবে। তখন আর পার হওয়া যাইবে না। আমি পূর্ব্বে একবার এখানে আসিয়া তিন দিন এই গুহায় বন্দী হইয়া ছিলাম। তিন দিন পরে জল নামিয়া গেলে তবে পার হইয়া চলিয়া যাই। আজও তাহাই হইবে।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখান হইতে বাহির হইয়া আপনি কোথায় যাইবেন ?"

তিনি বলিলেন, "শিভালিক পাহাড় পার হইয়া লাহোরের দিকে যাইব।"

আমি তখন অতি বিনীতভাবে বলিলাম, "যদি কিছু মনে না করেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—আপনি আমাকে কোথায় দেখিয়াছেন ?"

তিনি বলিলেন, "কলিকাতায়।"

আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কলিকাতায়! কবে ? কোথায় ?"

তিনি বলিলেন, "আপনি কি আমাকে মোটেই চিনিতে পারিতেছেন না ?"

আমি বলিলাম "না। কখন যে আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, তাহা ত আমার মনে পড়ে না।"

তিনি তখন বলিলেন, "আমি মনে করাইয়া দিতেছি। সে বোধ হয় সাত আট বৎসর পূর্ব্বের কথা। আপনি তখন কলিকাতায় পড়িতেন। আমি তখন কি করিতাম তাহা আর বলিব না। আমি কলিকাতাতেই বাস করিতাম। যে ভাবেই হউক, আমার দিন কাটিয়া যাইত। একদিন বিকাল বেলায় ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। আমি যে গলিতে বাস করিতাম, আপনি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সেই গলি

দিয়া বোধ হয় ঘরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। আপনার ছাতা ছিল না, বৃষ্টিতে কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল, বইগুলিও ভিজিয়া গিয়াছিল। আপনি যখন আমার বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন বৃষ্টি আরও জোরে পড়িতে লাগিল। আমার ঝি কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিল। বুড়া মানুষ এই জলবৃষ্টিতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়া না থাকে—এই মনে করিয়া আমি দুয়ার খুলিয়া কবাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সেই সময়ে আপনি ভিজিতে ভিজিতে আমার দ্বারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমি আপনার সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া আপনাকে বলি, "আপনি বড়ই ভিজিয়া গিয়াছেন; উপরে চলুন, কাপড় ছাড়িয়া, বিশ্রাম করিবেন। জল ছাড়িলে বাড়িতে যাইবেন।" আমার এই কথা শুনিয়া আপনি আমার দিকে চাহিলেন। আপনার সে দৃষ্টি এখনও আমার মনে আছে। তাহার পর হঠাৎ—"না" এই কথাটি মাত্র বলিয়া সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া গেলেন এবং দেখিতে দেখিতে আমাদের গলির মোড় পার হইয়া গেলেন।

"ভাই, আর আপনি বলিতে পারিতেছি না। তোমার সেই 'না' শব্দটা সেই মুহূর্ত্তে আমার বুকে আসিয়া বাজিল। কত পাপ করিয়াছি, কত ভালমন্দ কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন 'না' শব্দ কোন দিন আমার কাণে আসে নাই, এমন করিয়া আমার বুকের মধ্যে আঘাত করে নাই। আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার বোধ হইল প্রত্যেক বৃষ্টি-বিন্দু বলিতেছে—'না';—আমার মনে হইল আকাশের মেঘ গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে—'না, না';—আমার মনে হইল সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক স্বরে জলদগম্ভীর ধ্বনি করিতেছে—'না'।

'আমি তখন অধীর হইয়া পড়িলাম। কি কঠোর শব্দ, কি ভয়ানক শব্দ, কি হৃদয়ভেদী বাণী—ঐ 'না'। আমার জ্ঞান অপহৃত হইবার

মত হইল। আমি জানি না কেমন করিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম, কেমন করিয়া মাটিতে পড়িলাম। যখন জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন ভাই, তোমার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইল, তখনও আমি শুনিতে পাইলাম, তুমি বলিতেছ—'না'।

"সেই রাত্রিতেই আমি জ্বরে পড়িলাম। শুনিয়াছি বিকারের ঘোরে আমি না কি ক্রমাগত চীৎকার করিয়াছি **'না, না'**। তাহার পর আমি চিকিৎসার গুণে আরোগ্য লাভ করিলাম। কিন্তু সে আমি আর থাকিলাম না; কে যেন আমার মধ্য হইতে আমার পূর্ব্বের আমিকে একবারে সরাইয়া দিয়াছিল।

"তাহার পর কি হইল শুনিবে ভাই? আমি একদিন রাত্রিযোগে সমস্ত ফেলিয়া পথে বাহির হইলাম। কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, কাহারও উপদেশ লই নাই, শুধু জপমন্ত্র হইয়াছিল—ঐ 'না' শব্দ। আমি কত স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কত দেশে গিয়াছি, কত সাধু, কত মহাজন আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি নাই, আমি একই মন্ত্র পাইয়াছিলাম—সেই **'না'**।

"তাহার পর কেমন করিয়া কি হইল আমি জানি না, আমি বুঝি না, আমি বলিতে পারিব না। আমি তখন মনে মনে তোমার অনুসন্ধান করিলাম, মনে মনেই দেশ খুঁজিয়া দেখিলাম। তোমাকে এই দেরাদুন সহরে দেখিতে পাইলাম—তাই আমি এখানে আসিয়াছিলাম।

"তাহার পর কেমন করিয়া দেখিলাম তাহা আমি জানি না—তবে আমি জানিতে পারিলাম, তুমি আজ এখানে আসিবে—তোমাকে আজ আমায় দর্শন দিবার জন্য এখানে আসিতেই হইবে। তাই আজ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম! তোমায় দেখিলাম। তোমার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই ত ভাই! তোমার মুখে সে 'না' শব্দ নাই ত ভাই! বেশ, বেশ!

আমার সাধনা আজ সিদ্ধ হইল। তুমি তোমার পথে যাও ভাই! আমি চলিলাম।”

এই বলিয়া সেই দেবীপ্রতিমা পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া দ্রুতপদে নামিতে লাগিলেন; আমি তখন চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিলাম;—“দাঁড়াও, দাঁড়াও! একবার ফিরিয়া চাও।” আমি দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। তিনি কোন্ দিক দিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না; ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি আসিল। আমি আশ্রয় লাভের জন্য টপকেশ্বরের গুহায় গেলাম। সেই স্থানে, সেই শিবের পার্শ্বে বসিয়া এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা ভাবিতে লাগিলাম! এ কি ব্যাপার!

ঘণ্টাখানেক যাইতে না যাইতেই নদীতে জলস্রোত নামিয়া আসিল, ক্ষুদ্র নদী ফুলিয়া উঠিল, গর্জ্জন করিতে করিতে জলস্রোত চলিল। তখন আমার মনে হইতে লাগিল দূর—অতি দূর হইতে কে যেন কাতর স্বরে বলিতেছে—

‘না’

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের

অন্যান্য পুস্তক !

হিমালয়

(চতুর্থ সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর পুস্তকের নাম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে 'হিমালয়ের' কথা বলিতে হয় ! এই পুস্তকখানি লিখিয়া জলধর বাবু যদি তাঁহার লেখনীকে একেবারে বিশ্রাম দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে সর্ব্ব প্রধান ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-লেখক বলিয়া সাহিত্য-জগৎ অভ্যর্থনা করিত। হিমালয়ের চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে, হিমালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য-পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছে, হিমালয় লিখিয়া জলধর বাবু যশস্বী হইয়াছেন, বাঙ্গালা-সাহিত্য লাভবান্ হইয়াছে। এমন সুন্দর পুস্তক ঘরে ঘরে থাকা কর্ত্তব্য। সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য পাঁচসিকা (১।০) মাত্র।

বিশু দাদা

(সুবৃহৎ উপন্যাস)

পনর বৎসর বয়সের সময় জলধরবাবু 'দুঃখিনী' উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, আর ৫২ বৎসর বয়সে 'বিশু দাদা' লিখিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট উপন্যাস যখন ধারাবাহিকরূপে 'মানসী' পত্রে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন উক্ত পত্রের গ্রাহক ও পাঠকগণ বিশুদাদার পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য যে প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইতেই এই পুস্তকের আদরের কথা বুঝিতে পারা যায়। বিশুদাদা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী কাহিনী পড়িলে শুধু যে আনন্দ লাভ হয় তাহা নহে, ইহা পাঠের সময় সত্য সত্যই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কি পাপে আমরা এখন বিশুদাদার মত প্রভুপরায়ণ, মহানুভব, দেবহৃদয় ভৃত্য, বন্ধু, অভিভাবক পাই না। এই পুস্তকে যে কয়েকটী গান আছে, তাহা অতুল্য, অমূল্য। এই পুস্তক লিখিয়া জলধরবাবু ধন্য হইয়াছেন। "বিশুদাদা"য় দুইখানি আলোক-চিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে, সুন্দর ছাপা, মনোহর বাঁধাই, মূল্য পাঁচসিকা মাত্র

প্রবাস-চিত্র

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রবাসের কথা জলধর বাবু ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। প্রবাস-চিত্র বাঙ্গালা-সাহিত্যের একখানি অমূল্য রত্ন। যেমন বর্ণনা-কৌশল, তেমনই ভাবের প্রবাহ, তেমনই ভাষার মাধুর্য্য ; পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইতে হয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

পথিক

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পথিকে জলধর বাবু অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার পথিক পড়িলে সত্য সত্যই মনে হয় আমরা সকলেই পথিক ; দুই দিন পরে দেশে চলিয়া যাইব। যিনি লোকের হৃদয়ে এমন অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন, তিনি যে একজন উচ্চশ্রেণীর লেখক, তাহা আর বলিতে হইবে না। সুন্দর কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

নূতন গিন্নী

বহু পুরাতন হইলেও গিন্নী চিরদিনই নূতন। কিন্তু তাহা ভাবিয়া এ পুস্তকের নামকরণ হয় নাই। নূতন গিন্নীর ইতিহাস সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। আজকাল দেশের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই পুস্তকখানি কর্ত্তা, গিন্নী, বৌ, এমন কি সকলেরই পড়া কর্ত্তব্য। মূল্য দশ আনা মাত্র।

সীতা দেবী

জনমদুঃখিনী সীতার পবিত্র জীবন-কাহিনী অতি সরল, সুন্দর, প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া জলধর বাবু তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। বহু সুরঞ্জিত চিত্র-শোভিত, অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই। পুস্তকের তুলনায় মূল্য অতি সুলভ, এক টাকা মাত্র।